দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

একদেশ, একজাতি ও এক সংস্কৃতি ভারতের বৈশিষ্ট্য
—পৃঃ ১৩

নারী জাগরণেই সমাজের অভ্যুদয় ত্বরান্বিত হয়
—পৃঃ ১৬

৭৮ বর্ষ, ১৪ সংখ্যা।। ১ ডিসেম্বর, ২০২৫।। ১৪ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২।। যুগাব্দ - ৫১২৭।। website : www.eswastika.com

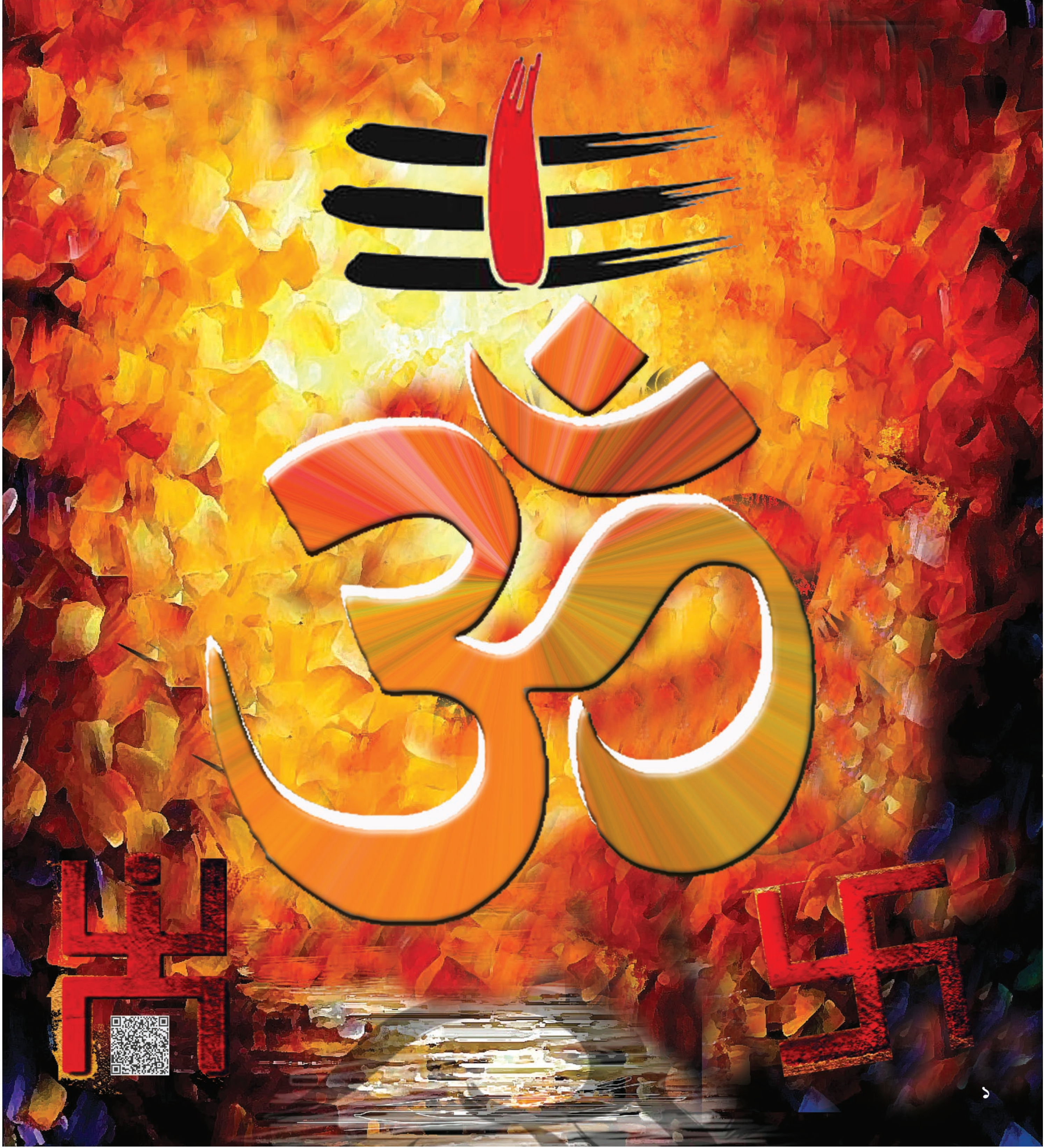

কুটুম্ব প্রবোধন → লক্ষ্য

যৌথ পরিবার

সংগঠিত পরিবার

সশক্ত পরিবার

সুস্থ পরিবার

সুরক্ষিত পরিবার

সমর্থ পরিবার

সম্পন্ন পরিবার

সুসংস্কৃত পরিবার

সমৃদ্ধ পরিবার

ব্যবস্থিত পরিবার

প্রভাবশালী পরিবার

আদর্শ পরিবার

প্রতিষ্ঠিত পরিবার

সন্তুষ্ট পরিবার

সুখী পরিবার

আনন্দিত পরিবার

আপনার এলাকায় কুটুম্ব প্রবোধন গতিবিধির কেন্দ্র খুলতে চাইলে
এই নম্বরে যোগাযোগ করুন— ৯৮৩৬৪৪৫৫২২ (9836445522)

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৮ বর্ষ ১৪ সংখ্যা, ১৪ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

১ ডিসেম্বর - ২০২৫, যুগাব্দ - ৫১২৭,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2025-2027

R N I Regd. No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

বিএলও আত্মহত্যার মিথ্যা মানব প্রাচীর তৈরি করে বাঁচবে তৃণমূল? : গঙ্গাপ্রাপ্তি ◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

দিল্লিতে দিদি বড্ড ঠাণ্ডা ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

স্বাভিমানী জীবনের একটি দিক—নৈনন্দিন জীবনে 'স্ব'-এর পুনঃস্থাপনা ◻ দত্তাত্রেয় হোসবলে ◻ ৮

যুগের আহ্বান—হিন্দুদের সংগঠিত হওয়া ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই ◻ শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী ◻ ১১

একদেশ, একজাতি ও এক সংস্কৃতি—ভারতের বৈশিষ্ট্য

◻ সত্যনারায়ণ মজুমদার ◻ ১৩

নারীশক্তির জাগরণেই সমাজের অভ্যুদয় ত্বরান্বিত হয়

◻ কেয়া ঘোষ ◻ ১৬

ভারত-বিরোধিতা, আক্রমণ, লাভজেহাদ, অনুপ্রবেশ—সবেতেই বামপন্থীরা গিরগিটি

◻ অমিত দাশ ◻ ২০

'পশ্চিমবঙ্গের ধান-সংস্কৃতির মিঠেল উৎসব নবান্ন ◻ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী ◻ ৩১

পূর্বভারতের অসীম সাহসী বীরযোদ্ধা লাচিত বরফুকন

◻ ওম প্রকাশ ঘোষ রায় ◻ ৩২

ভারতীয় অস্ত্রোপচারের জনক মহর্ষি সুশ্রুত

◻ দীপক খাঁ ◻ ৩৪

ভারতীয় নারী : অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

◻ দেবযানী ভট্টাচার্য্য ◻ ৩৫

হিন্দুত্বের সংজ্ঞা—বর্তমানের প্রেক্ষিতে ◻ শ্রী অরুণ কুমার ◻ ৪৩

নিয়মিত বিভাগ :

◻ **অঙ্গনা : ২১** ◻ **সুস্বাস্থ্য : ২২** ◻ **সমাবেশ সমাচার : ২৩-৩০** ◻ **খেলা : ৩৯** ◻ **নবাঙ্কুর : ৪০-৪১** ◻ **স্মরণে : ৫০** ◻

ফঃ ১

প্রকাশিত হবে
৮ ডিসেম্বর
২০২৫

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রকাশিত হবে
৮ ডিসেম্বর
২০২৫

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা ভারতীয় জীবনদর্শনের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এই দর্শন মানুষকে কর্মফলের প্রতি আসক্ত না রেখে কর্মের ওপর জোর দেওয়ার শিক্ষা দিয়েছে। এটি সর্বযুগে, সর্বকালে মানুষের আচরণবিধি, যা জীবনের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে সহায়ক।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় এই বিষয়েই আলোকপাত করবেন কয়েকজন বিশিষ্ট লেখক।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :

INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market**

Kolkata-700 006

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার বার্ষিক গ্রাহকদের প্রতি সপ্তাহে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০্ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ২১০০্ টাকা (মোট ২৮০০) টাকা পাঠাতে হবে।

যে সকল গ্রাহক প্রতি মাসের পত্রিকা (৪/৫টি) একত্রে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নিতে ইচ্ছুক তাদের গ্রাহক মূল্য ৭০০্ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ৫৫০্ টাকা (মোট ১২৫০ টাকা) পাঠাতে হবে।

যোগাযোগ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫   ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693   IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

হিন্দুত্বই ভারতের রাষ্ট্রীয়ত্ব

ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, 'গ্রিসের যখন জন্ম হয় নাই, রোমের কথা যখন কাহারো চিন্তায় আসে নাই, বর্তমান ইউরোপের পূর্বপুরুষেরা যখন বনে জঙ্গলে বাস করিত এবং শরীরে নীল রং লেপন করিয়া গাত্রবর্ণে জৌলুস আনিত, সেই সুদূর অতীতেও ভারতবর্ষে সভ্যতাসূচক কর্মধারা প্রবহমান ছিল।' পরবর্তীকালে সেই সভ্যতাকে বিশ্ববাসী হিন্দু সভ্যতা এবং ভারতবর্ষের শাশ্বত ও সনাতন জীবনধারার ধারক ও বাহকগণকে হিন্দু নামে অভিহিত করিয়াছে। হিন্দু জাতির গুণাত্মক বিশেষণই হইল হিন্দুত্ব। স্বয়ং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াছেন, হিন্দু হইল ভারতবর্ষের জাতিগত পরিণাম। ভারতীয়ত্ব ও হিন্দুত্ব একটি সমার্থক অভিধা। ভারতবর্ষীয় জীবনবোধ বা ধর্মের নাম সনাতন ধর্ম। হিন্দুগণই এই ধর্মের মধ্যে প্রতিপালিত হইয়াছে এবং বহন করিয়া চলিয়াছে বলিয়াই ইহা হিন্দুধর্ম নামেই বিশ্বে পরিচিতি লাভ করিয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, জগতে প্রত্যেক জাতির একটি ভাব রহিয়াছে এবং প্রত্যেক জাতির অন্যকে দান করিবার একটি বাণী রহিয়াছে। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে তাহা আধ্যাত্মিকতা যাহা একটি জীবন ধারা এবং ভারতীয় জীবন ব্যবস্থাও বটে। ইহার নামই হিন্দুত্ব। ১৯৯৫ সালে ভারতের সর্বোচ্চ আদালত একটি রায়ে পরিষ্কার বলিয়াছেন যে, হিন্দুত্ব হইল ভারতীয় জীবনধারা— ওয়ে অব লাইফ। এই মহান জীবন ব্যবস্থার জন্যই বহু বহিরাগত জাতি ভারতবর্ষের সহিত একাত্ম হইয়া গিয়াছে। কেননা হিন্দুত্ব হইল সর্বসমাবেশক। হিন্দুগণ সর্বভূতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করিয়াছে। সকলের মধ্যে একই পরমাত্মার উপস্থিতি অনুভব করিয়াছে। সকলের জন্য ন্যায় ও সমতাকে স্বীকার করিয়াছে। অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষের মহাপুরুষগণ এই মহান জীবনধারার প্রবহমানতার জন্য জীবন সমর্পণ করিয়াছেন। অসংখ্য সাধু-সন্ন্যাসী, দেশভক্ত, বীর যোদ্ধা, বিপ্লবী ইহার সংরক্ষণ ও সংবর্ধনের জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। মনে রাখিতে হইবে, হিন্দুত্ব উপাসনা পদ্ধতির পরিচায়ক নহে, ইহা ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয়তা বা জাতীয়তারই অপর নাম। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার 'আত্মপরিচয়' প্রবন্ধে ভারতে বসবাসকারী মুসলমানদিগকে হিন্দু-মুসলমান এবং খ্রিস্টানদিগকে হিন্দু-খ্রিস্টান বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বোম্বাই হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এম সি চাগলার ন্যায় মুসলমান ব্যক্তিত্ব স্বীকার করিতেন যে তিনি জাতিতে হিন্দু কিন্তু উপাসনা পদ্ধতিতে মুসলমান। এককথায় বলা যাইতে পারে, ভারতবর্ষকে যাঁহারা মাতৃভূমি, পুণ্যভূমি ও কর্মভূমি বলিয়া মনে করেন তাঁহাদের সকলের জাতিগত পরিচয় হিন্দু। বহু মুসলমান ও খ্রিস্টান বিদ্বান ব্যক্তিত্ব এই ঐতিহাসিক সত্যকে স্বীকার করিয়া এই দেশের সহিত একাত্ম হইয়াছেন।

বহু শতাব্দীর অত্যাচার ও পরাধীনতার কালেও এই রাষ্ট্রীয়তার বোধ ভারতবাসীর মন হইতে লুপ্ত হয় নাই। কিন্তু এই ঐতিহাসিক সত্যকে জাতির মন হইতে উৎপাটিত করিবার জন্য সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজ নানা চেষ্টা করিয়াছে। ভারতবর্ষকে পরাধীন ও পদদলিত করিয়া রাখিবার স্বার্থেই তাহারা ইহা করিয়াছে। বৈদেশিক মতাদর্শ জারিত কমিউনিস্টরাও তাহা করিয়াছে এবং অদ্যাবধি করিয়া চলিতেছে। ভোটভিখারি কংগ্রেস ও তাহার সহযোগী দলগুলিও এই অপকর্ম করিয়া চলিয়াছে। কংগ্রেসেরই নীতিহীনতায় দ্বিজাতিতত্ত্বের উদ্ভব হইয়াছে এবং পরিণামে দেশমাতৃকার অঙ্গচ্ছেদ ঘটিয়াছে। স্বাধীনতার বহু বৎসর অতিবাহিত হইবার পরেও তাহারা রাষ্ট্রীয়তার স্বরূপ অনুধাবন করিতে পারে নাই। কমিউনিস্ট এবং তথাকথিত সেকুলার ঐতিহাসিকগণ সর্বদাই এই রাষ্ট্রীয়তার অপব্যাখ্যা করিয়াছে। হিন্দুত্বের ন্যায় এক অনন্যসাধারণ জীবনধারাকে তাহারা হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করে নাই। স্বামীজী বলিয়াছেন, 'যাহা কিছু মহান, যাহা কিছু উন্নত— হিন্দু শব্দ তাহারই ইঙ্গিত বহন করিতেছে। হিন্দু শব্দের চাইতে অধিকতর গৌরবজনক, অধিকতর সম্মানসূচক শব্দ কোনো ভাষাতেই মিলিবে না। আমাদের পূর্বপুরুষগণ আমাদের জন্য যে অমূল্য নিধি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাকে রক্ষা করিতে হইবে।' আশার কথা যে, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকগণ শতবর্ষ ধরিয়া হিন্দুত্বই যে ভারতের রাষ্ট্রীয়ত্ব তাহা নিজেদের জীবনের মাধ্যমে উদাহরণ সৃষ্টি করিয়া রাষ্ট্র নির্মাণ কার্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। সুখের কথা যে, সমস্ত রকম বিভ্রান্তি হইতে মুক্ত হইয়া ভারতবাসী এই ঐতিহাসিক সত্যকে উপলব্ধি করিতে শুরু করিয়াছে।

সুভাষিতম্

যদা ন কুরুতে ভাবং সর্বভূতেষ্বমঙ্গলম্।
সমদৃষ্টেস্তদা পুংসঃ সর্বাঃ সুখময়া দিশঃ।।

অর্থ ঃ যিনি কোনো প্রাণীর প্রতি অমঙ্গলের ভাব রাখেন না, সকলকে সমদৃষ্টিতে দেখেন, এরকম ব্যক্তির সর্বদিকে কেবল সুখই বিরাজ করে।

বিএলও আত্মহত্যার মিথ্যা মানব প্রাচীর তৈরি করে বাঁচবে তৃণমূল?

গঙ্গাপ্রাপ্তি

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

বিহার বিধানসভা নির্বাচনের পর এই রাজ্যের ভোটে তৃণমূল সরকারের অপমৃত্যু হয়তো অবশ্যম্ভাবী। অদূর ভবিষ্যতে এই সরকারের গঙ্গাপ্রাপ্তির রেখা টানতে চলেছেন এ রাজ্যের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। কথায় আছে ভাগের মা গঙ্গা পায় না। তৃণমূলের দশটা কর্তা আর কর্ত্রী। প্রশাসনিক চুরি, দুর্নীতি, তোলাবাজি এবং অসংখ্য সিন্ডিকেটের মাধ্যমে তারা রাজ্য চালায় বলে অভিযোগ। বিহার নির্বাচনে এনডিএ-র বিশাল জয় তৃণমূলের কাছে কষ্টকল্পিত ছিল। এই নির্বাচনে এনডিএ জোট ২০২টি আসন পেয়ে সব নির্বাচনী ভবিষ্যদ্বাণী ভুল প্রমাণ করে দেয়। ইজরায়েলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্যালেস্তিনীয়রা কাপুরুষের মতো মহিলা ও শিশুদের 'হিউম্যান শিল্ড' বা মানবপ্রাচীর হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর আটকাতে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রী তাই করছেন। কিছু বিএলও-র আত্মহত্যাকে এসআইআর-এর সঙ্গে যুক্ত করে এই মানবপ্রাচীর গড়তে তিনি ব্যস্ত।

প্রধানমন্ত্রীর প্রতীকী ব্যাখ্যাকে কিছু অর্ধশিক্ষিত ও মূর্খের দল 'হুগলীর গুগলি' বলে অপব্যাখ্যা করেছে। কিছু অতি পণ্ডিত ভোট ব্যাখ্যাকারের দাবি— 'এসআইআর' কেবল পশ্চিমবঙ্গ জয় করতেই ভারতীয় জনতা পার্টি চালু করেছে। বিহারে তার সফল পরীক্ষা হয়েছে বলে এইসব নির্বাচনী বিশ্লেষকদের দাবি। অথচ কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন শাসক দল বা শাসক জোটের নির্দেশে বিভিন্ন রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়া চালু হয়নি। ২০২৫-২৬-এ যে রাজ্যগুলিতে বিধানসভা নির্বাচন হচ্ছে বা হতে চলেছে— মূলত সেই রাজ্যগুলির ভোটার তালিকাতে বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর-এর প্রক্রিয়া শুরুর নির্দেশ জারি করেছে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন। এমনকী সামনের বছর বিধানসভা ভোট থাকলেও অসমে 'এসআইআর' হচ্ছে না, কারণ সেখানে নাগরিক পঞ্জীকরণ চলছে। অথচ এই তথাকথিত পণ্ডিতদের দাবি, কেন্দ্রীয় লক্ষ্য নাকি— 'পশ্চিমবঙ্গ'। গঙ্গানদী বিহার থেকে ঝাড়খণ্ড হয়ে পশ্চিমবঙ্গের ফরাক্কায় এসে তিন ভাগে ভাগ হয়ে যায়— হুগলী, ভাগীরথী ও পদ্মায়। শেষ ধারাটি বাংলাদেশে প্রবেশ করে। তাই বিহার থেকে গঙ্গার একটি মাত্র ধারা কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে পৌঁছায় না। তেমনই বিহারের এসআইআর প্রক্রিয়ার প্রভাব বা বিহারের স্থানীয় রাজনীতির প্রভাব পশ্চিমবঙ্গে দৃশ্যমান হবে কী না তা বলা এখনই মুশকিল! অনেক তথাকথিত পণ্ডিতের ধারণা বিহারের সাম্প্রতিক ভোটের ফলের কোনো প্রভাব এরাজ্যে পড়বে না।

বিদেশি বাম ও কংগ্রেস এরাজ্যে কেবল অসহায়তার প্রতীক। রাজ্যের ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা 'এসআইআর' বন্ধ করার জন্য নির্বাচন কমিশনকে চিঠি দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। তৃণমূলের এক নেতা ঠাট্টা করলেন ওটা গঙ্গাপ্রাপ্তির চিঠি। পত্রের কোণে ঈশ্বর চিহ্নের আবছা নিশান রয়েছে। এসআইআর নিয়ে তৃণমূলনেত্রী এখন অনেকটাই ব্যাকফুটে। অহেতুক বিরোধিতা তার প্রমাণ। তৃণমূল দল ও সরকারের গঙ্গাপ্রাপ্তি রুখতে মুসলমান তুষ্টীকরণের শেষ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। কমিশনকে চিঠি দেওয়া মুসলমান ভোটব্যাংক ধরে রাখা একটি ভাবনা। নির্বাচনী প্রক্রিয়া যত এগোবে, এই ধরনের আরও নতুন ভাবনা তিনি তৈরি করবেন। মুসলমান ভোটব্যাংক রক্ষা বা মুসলমান ভোট কনসোলিডেশনের পরিবর্তে এবারে মুসলমান ভোটের ভাঙন রোখা হলো তার মূল চেষ্টা। কমিশনকে চিঠি দেওয়ার পরিণতি শূন্য হতে বাধ্য। মুসলমানরা যে বিজেপি-বিরোধী নন, বিহারের ভোট তা ইতিমধ্যেই প্রমাণ করেছে। বিহারের ৮৪টি তথাকথিত মুসলমান অধ্যুষিত আসনের মধ্যে এনডিএ জোট ৬৪টি আসন জিতেছে। তৃণমূলনেত্রী চান সে চিত্র যাতে এখানে ফলপ্রসূ না হয়।

বামপন্থীদের শ্রেণী রাজনীতির অনুকরণে তৃণমূল মুসলমান রাজনীতি করে। গত ৪৯ বছরে উভয় ক্ষেত্রে হিন্দু বিদ্বেষ তীব্রভাবে প্রকট হয়েছে। এ রাজ্যে প্রায় সাড়ে চার থেকে পাঁচ শতাংশ মুসলমান ভোট সরে যাওয়ায় বিদেশি বামেদের কোমর ভেঙে যায়। আগামী অর্ধশতকেও তা জোড়া লাগবে না। কংগ্রেসের মাত্রাহীন পতনও যেমন রোখা যাবে না। এসআইআর-এর বিরোধিতা করে 'শব পোড়া মরা দাহ'-র রাজনীতি করছেন মুখ্যমন্ত্রী। এসআইআর-এর গুঁতোয় বেআইনি ভোটাররা পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে পালাচ্ছে। রাজ্যপাটে লেখা হয়েছে সিপিএমের মতো তৃণমূলনেত্রী কীভাবে জল ভোটে জেতেন। ভোটার তালিকা থেকে জল বেরিয়ে গেলে তৃণমূলের গঙ্গাপ্রাপ্তি যে নিশ্চিত— প্রধানমন্ত্রী সে ইঙ্গিত করেছেন। গোয়েন্দা রিপোর্টের দাবি, প্রায় ১ কোটি ১৫ লক্ষ বেআইনি ভোটারের নাম বাদ যেতে পারে। এদের অধিকাংশ ভোটই তৃণমূলের প্রতীকে পড়ে থাকে। বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী মুসলমানরা ভারতের শত্রু। বাংলাদেশে গত বছরের আগস্ট মাসে অনাসৃষ্টির পর বাংলাদেশিদের এই শত্রুতার মাত্রা আরও বেড়েছে। এই মুহূর্তে অনুপ্রবেশ ও অনুপ্রবেশকারীদের বিরোধিতার সামর্থ্য মুখ্যমন্ত্রীর নেই। তাই রাজ্যের মুসলমান সম্প্রদায়কে অসম্মানসূচক গোরু বা 'দুধেল গাই' বলেও তিনি পার পেয়ে যান। বিহারের মতো এরাজ্যের ভোটে হয়তো সে দুধে এবার চোনা পড়বে। তাই মুসলমান ভোটব্যাংক নিয়ে তিনি ঝুলে পড়েছেন। কোনো হিন্দু সংখ্যাধিক্যের রাজ্যে কেবল মুসলমানদের বাড়তি সুবিধা দেওয়া যেমন হিন্দুবিরোধী তেমনই আবার মুসলমান বিরোধী। পশ্চিমবঙ্গ আর বিহারের মানুষের মানসিকতার পার্থক্য বোঝাতে হিন্দুবিরোধীরা রাস্তায় নেমেছেন। অথচ বিহারের ভোটের আগে এরাই দাবি করছিলেন যে, পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মতো বিহারেও নাকি সাধারণ মানুষ বিজেপিকে প্রত্যাখ্যান করবে। এইসব মুসলমানি আর দেশবিরোধী সমাজমাধ্যম আর বুদ্ধুজীবীর দলকে যেন শায়েস্তা করার সময় এসেছে। তৃণমূলের গঙ্গাপ্রাপ্তি যতটা সহজ মনে হয়, এই বিষপোকাদের বাগে আনা ততটাই কঠিন। *(লেখকের মতামত ব্যক্তিগত)*

দিল্লিতে দিদি বড্ড ঠান্ডা

দিদি নয় পিসি,

এবারের চিঠি আমার দিদিকে নয়, এক ভাইপোর পিসিকে লিখছি। আমি জানি ভাইপো যেতে চাইবে না তবু বলছি দিদি, এসআইআর নিয়ে যেভাবে ঘেঁটে গিয়েছেন তাতে এই শীতে ভাইপোকে আর দিল্লি পাঠাবেন না। আমি ভাইপোর কথা ভাবছি না, আমার চিন্তা এরাজ্যের সেই সব গরিবগুর্বো মানুষগুলোর জন্য যাঁরা আপনার কথায় সব করতে পারে। ভোট চুরি থেকে মারামারি।

একের পর এক স্বপ্ন ভেঙে যাচ্ছে ভাইপোর। ক'দিন আগেই তো আপনি একটা স্বপ্ন ভেঙে দিয়েছেন। নেতা হওয়ার স্বপ্ন। ভাইপো চেয়েছিলেন কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ একটা যাত্রা করবেন নভেম্বর আর ডিসেম্বর মিলিয়ে। শখ ছিল নিজেকে গোটা রাজ্যে পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী মুখ হিসেবে তুলে ধরা। কিন্তু আপনি বুঝিয়ে দিয়েছেন অত নেতাগিরি দেখানো যাবে না। ভাইপো চেয়েছিলেন রাজ্যে ঘুরে ঘুরে দলের এসআইআর ক্যাম্প পরিদর্শন করবেন। আপনি জানতে পেরেই না বলে দিয়েছেন। ঠিকই করেছেন। যে পূজা হতেই দেবেন না বলেছিলেন তার মণ্ডপে মণ্ডপে ঘোরা কি ঠিক নাকি! এসআইআর তো গণতন্ত্রের পূজাই দিদি।

ভাইপো বলেছিলেন রাজ্যে একটা নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ গেলে তিনি কত ধানে কত চাল বোঝাতে দিল্লি যাবেন। সেটা আবার একা নয়, এক লক্ষ মানুষকে নিয়ে। নির্বাচন কমিশন খসড়া তালিকা প্রকাশ করবে আগামী ৯ ডিসেম্বর। একটা নাম বাদের প্রশ্ন নেই, সেই তালিকায় এখনো পর্যন্ত যা ইঙ্গিত তাতে কোটির উপরে নাম বাদ যাবেই। সেসব বাদ দিচ্ছি, ভবানীপুর মানে আপনার বিধানসভা আসন থেকে একটা নাম বাদ যাচ্ছেই। প্রশান্ত কিশোর। বিহারে মুখ পোড়ানো পিকে তো ২০২১ সালে আপনাকেই ভোট দিয়েছেন। তাঁর নাম তো বাদ যাবেই নাকি। কারণ, তিনি তো আসলে বিহারের ভোটার।

এবার ভাইপো যদি সত্যিই এক লক্ষ লোক নিয়ে দিল্লি যান, (যদিও পারবেন না) তা নিয়েই আমার চিন্তা। আমি ধরে নিয়েছিলাম, ৯ ডিসেম্বর খসড়া তালিকা প্রকাশের পরের প্রথম শনি-রবি দিল্লিতে হবে ভাইপোবাবুর অভিযান। মানে ১৩ ও ১৪ ডিসেম্বর। সেই সময়ে দিল্লিতে তো খুব ঠান্ডা পড়ে যাবে। সেই সময়ে রাজধানী দিল্লিতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকতে পারে ৯ ডিগ্রির মতো। দিনের বেলাতেই ২১ ডিগ্রি।

দিদি, ভাইপোর না হয়, দিল্লিতে সাংসদ হিসেবে সরকারি বাংলো আছে। অন্য সাংসদদেরও আছে। অনেক বিধায়কের নিজস্ব বাসভবনও রয়েছে। সেখানে তো আর এক লক্ষ লোক ধরবে না। তাঁরা কোথায় থাকবেন। রাস্তা ঘাটে, ব্রিজের তলায় দিল্লি সরকার অনুমতি দেবে কি! সেই অনুমতি দিয়ে দিলেও ওই ঠান্ডায় পশ্চিমবঙ্গের গরিব গুর্বো লোকজন থাকবেন কী করে! প্লেনে, ট্রেনে, বাসের ভাড়া, খাওয়া খরচ না হয় ভাইপো দিয়ে দেবেন। টাকার তো অভাব নেই। কিন্তু তাঁদের তো পর্যাপ্ত শীতপোশাকও নেই।

এদিকে কমিশনের চিন্তা অন্য। দেখা যাচ্ছে অন্য রাজ্যের থেকে পশ্চিমবঙ্গের ছবি আলাদা। মৃত্যুহারের সঙ্গে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ার সংখ্যার মিল নেই। সংশোধিত ভোটার তালিকায় মৃতদের খুঁজে বার করার কাজ জেলা প্রশাসনের। কিন্তু পুরোটা ভরসা না করে সরাসরি কমিশনের দল সে কাজ করবেন। শ্মশান, সমাধিস্থল, পঞ্চায়েত-পুরসভা বা হাসপাতাল থেকে নথিবদ্ধ মৃত্যুর শংসাপত্র সংগ্রহ করে মৃতদের খোঁজার কাজ ঠিকঠাক হবে কিনা সন্দেহ। তাই ঠিক হয়েছে, ব্যাংক, ডাকঘর থেকে হিসেব নেওয়া হবে। এলআইসি-র থেকেও।

ব্যাংক বা ডাকঘরের অ্যাকাউন্ট বা জীবন বিমায় সকলকেই নমিনির নাম দিতে হয়। কোনো গ্রাহকের মৃত্যু হলে ব্যাংক, ডাকঘরকে মৃত্যুর শংসাপত্র জমা দিতে হয়। তবেই অ্যাকাউন্ট চলে যায় 'নমিনি'-র নামে। ফলে জমে থাকা অর্থ নমিনি পান। এর ফলে সকলেই সঠিক তথ্য দেন। কারও মৃত্যুর পর এলআইসি-র টাকা পেতেও লাগে ডেথ সার্টিফিকেট। এই ব্যবস্থাগুলি অনলাইনে পরিচালিত হওয়ায়, এখান থেকে মৃত ব্যক্তিদের খোঁজ পাওয়াও সহজ। ফলে ফাঁকি দেওয়ার সুযোগ দিতে চাইছে না কমিশন। ভাইপোবাবু মুখ্য নির্বাচন কমিশনের বাবা তুলে মনে হয় ঠিক করেননি।

সব মিলিয়ে শুধু মৃত ভোটারের সংখ্যাই ৫০ লক্ষ হওয়ার সম্ভাবনা। ওদিকে বাংলাদেশ সীমান্তে দিন দিন পালিয়ে যাওয়ার ভিড় বাড়ছে। তাঁরা সব বিস্ফোরক কথাও বলছেন। কোথা দিয়ে ঢুকেছেন, কোথায় ছিলেন, কে আধার, ভোটার কার্ড করে দিল— সবেতেই দেখা যাচ্ছে দুই ২৪ পরগনার নাম বেশি।

কী যে হবে পিসি সরি দিদি! □

অতিথি কলম

দত্তাত্রেয় হোসবলে

স্বাভিমানী জীবনের একটি দিক
দৈনন্দিন জীবনে ‘স্ব’-এর পুনঃস্থাপনা

‘স্ব’-এর ভাবনা যদি পুস্তক বা সংগ্রহশালায় আবদ্ধ হয়ে যায়, দৈনিক জীবনে প্রকটিত না হয় তবে এর কোনো অর্থ হয় না। তাই দৈনন্দিন জীবনে ‘স্ব’-এর প্রকাশ হওয়া চাই।

যৌথ পরিবারই আদর্শ পরিবার। এইরকম পরিবারে শিশুদের মনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংস্কার নিজের থেকেই আসে। এ কেবল পরিবারের একজনের দায়িত্ব নয় বরং বাড়ির বয়স্ক, যাঁরা ছোটোদের দেখাশোনা করেন, তাঁদের সকলেরই দায়িত্ব। এই সমস্ত পরিবারে শিশুদের মূল্যবোধ জাগ্রত হয় এবং সমাজে প্রকৃত মানুষ তৈরি হয়।

পরিবার থেকেই সংস্কার : আমাদের পরম্পরা হলো— শিশু জন্মগ্রহণ করলেই তাকে দেবঋণ, পিতা-মাতার ঋণ, ঋষি ঋণ ও সমাজ ঋণ শোধ করতে হয়। কথায় বলে— ধন্য গৃহস্থাশ্রম! কারণ গৃহস্থাশ্রমের দ্বারাই অন্য আশ্রমের কাজ চালু থাকে। তাই পরিবার হলো সামাজিক রচনার মূল একক। এটা সমাজের ভিত্তি, তাই এর গুরুত্বের প্রতি মনোযোগ দেওয়া জরুরি।

রাষ্ট্র রক্ষায় পরিবারের ভূমিকা : আমাদের দেশের উপর অনেক আক্রমণ হয়েছে। আক্রমণকারীরা আমাদের অনেক ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করে নিয়ে গেছে, তবুও আমরা শেষ হয়ে যাইনি। কারণ হলো আমাদের শক্তিশালী পরিবার ব্যবস্থা। যতক্ষণ পর্যন্ত পরিবারের উপর আঘাত আসছে না ততক্ষণ দেশ বেঁচে থাকবে। কারণ পরিবারের লোকেরাই সমাজের কাজে এগিয়ে আসবে। সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তন হলে নিজেদেরকেও মানিয়ে নিতে হয়। বর্তমান সময়ে চার ভাইয়ের পরিবার একসঙ্গে এক বাড়িতে থাকবে তা হয়তো ব্যবহারিক নয় কিন্তু সব ভাই-বোনেদের পরিবারের মধ্যে নিত্য সম্পর্ক ও যোগাযোগ অবশ্যই থাকবে। পরস্পর কথাবার্তা ব্যক্তিগতভাবে না হলেও ভিডিয়ো কল, ফোন করা ইত্যাদির মাধ্যমেও হতে পারে। বছরে কমপক্ষে একবার সকলের মিলিত হওয়া জরুরি। নিজেদের মধ্যে পরস্পর সুখ-দুঃখের অংশীদার হওয়া উচিত, তাতে সম্পর্ক ভালো থাকে ও মজবুত হয়। পরিবার ছোটো-বড়ো যাই হোক না কেন, এরকম স্বাভাবিক মেলামেশার ফলে ভাবনা তৈরি হয় যে, আমরা সকলে একই পারিবারের। আমারা ছোটোবেলায় দেখেছি— যতক্ষণ বাড়ির সকলে না আসছে, মা খাবার পরিবেশন করবেন না, তাঁর ইচ্ছা থাকত সারাদিনে একবার অন্তত সকলে একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া করুক। আজকাল এক টেবিলে এলেও কেউ মোবাইল, কেউ টিভি নিয়ে ব্যস্ত থাকি। অর্থাৎ পরস্পর কথাবার্তা বলি না। প্রকৃতপক্ষে সকলে সারাদিন বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকার পর এই সময় মন খুলে কথা বলার সময়, কিন্তু তা করি না। এরকম দৃশ্য দেখতে ছোটো ও গুরুত্বহীন হলেও পরিবারের সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য খুবই জরুরি।

ব্যবহার থেকেই শিক্ষা : ব্যক্তির জীবনে মূল্যবোধ জাগ্রত হয় পরিবারের প্রবীণদের আচরণ থেকে। সকলের সঙ্গে বয়স অনুপাতে বুঝেশুনে ব্যবহার করা ও কথা বলা উচিত। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কীরকম ব্যবহার করব বা সম্পর্ক বজায় রাখব, তাদের ব্যক্তিত্ব কেমন নির্মাণ করব, তার শিক্ষা শব্দ থেকে নয় বরং পারস্পরিক ব্যবহার থেকে তৈরি হয় এবং বজায় থাকে। বড়ো শহরে অনেক লোক এক-একটি আবাসনে থাকে। নিজেদের ব্যস্ততার কারণে একজন জানে না পাশে কোন পরিবার থাকে। এটা সমাজের পক্ষে ভালো ব্যবস্থা নয়। মাসে/ছমাসে একটা দিন অন্তত সকলে একত্রে মিলিত হওয়া উচিত। ঘরোয়া কথাবার্তা হওয়া উচিত। এরদ্বারা ঘরের বাইরে একটা বড়ো পরিবার তৈরি হবে। এর মাধ্যমে পারিবারিক ব্যবস্থা আধুনিক হবে।

মাতৃভাষায় কথাবার্তা : পরিবারে ভাষা, ভূষণ, ভজন, ভোজন, ভ্রমণ, ভবন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হওয়া উচিত। সঠিক ভাবনার দ্বারা প্রত্যেক পরিবারে এই ছ'টি বিষয়ে প্রগতি হতে পারে। পরিবারে মাতৃভাষায় কথাবার্তা হওয়া উচিত। পরিবারের সদস্যরা অন্য ভাষা জানলেও মাতৃভাষায় কথা বললে নিজ ভাষার প্রতি ভালোবাসা থাকবে। সেই সঙ্গে কথাবার্তা অন্তরঙ্গ ও মনোগ্রাহী হবে। অনেকে ভাবেন সারাদিনে ছেলে-মেয়ের পড়ার খোঁজ খবর নিলেই যথেষ্ট কিন্তু তার বাইরেও দৈনন্দিন ব্যবহারিক কথা বলা প্রয়োজন। এমনকী মাতৃভাষায় প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা বাড়িতে রাখা, পড়ার অভ্যাস করা, সেই বিষয়ে

আলোচনা করা প্রয়োজন। এর দ্বারা কেবল মাতৃভাষা জীবিত থাকবে তাই নয়, পারিবারিক স্তরে সচেতনতা বজায় থাকবে। ভাষার ব্যাপারে যেমন চিন্তা করব, বেশভুষার ব্যাপারেও চিন্তা করা উচিত। প্রয়োজনবোধে আমাদের পোশাক বদল হয়েছে তাতে দোষের কিছু নেই। কিন্তু উৎসব অনুষ্ঠানে পরম্পরাগত যে কোনো ভারতীয় পোশাক অবশ্য পরা উচিত। পোশাক পরিচ্ছদ আমাদের সংস্কৃতির পরিচায়ক একথা ভুললে চলবে না।

ভ্রমণ : বছরে একবার পরিবারের সকলে কোনো ধর্মীয় স্থানে বেড়াতে যাওয়া চাই। সেক্ষেত্রে পরিবারের সকলকে সম্মিলিত করা উচিত। এতে কেবল পুণ্য অর্জন হবে তাই নয়, পরোক্ষভাবে কিছু শিক্ষা লাভ হবে। যেখানে যাবে সেখানকার জনজীবন সম্পর্কে, সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা হবে যে সারা দেশের সংস্কৃতি এক সূত্রে বাঁধা। বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণ করলে দেশের গৌরবশালী ইতিহাস জানা যাবে। এক কথায় বলতে গেলে পর্যটন শুধুমাত্র বেড়ানো বা বিনোদনের জন্য নয়, সমগ্র দেশকে অনুভব করার জন্য।

ঘরের পরিবেশ ও খাদ্য : নিজের ঘরে আধুনিক সবরকম ব্যবস্থা থাকবে কিন্তু সম্পূর্ণ পরিবেশ পরম্পরাগত হওয়া চাই। ঘর কেবল ইট, বালির নয় বরং দেবতার আলয়। সেই ঘর সকলের অন্তরে প্রেরণা জাগাবে। ঘর হোটেল নয়, ঘরের দেওয়ালে মহাপুরুষদের ছবি থাকবে এবং ছোটোদের প্রত্যেককে তার পরিচয় করাতে হবে। স্থানীয় খাবার প্রাধান্য পাওয়া উচিত। ঘরের বাইরে হোটেলে বিভিন্ন দেশ-বিদেশের সুস্বাদু খাবার পাওয়া যায়, সেগুলো ঘরেও বানানো যেতে পারে। কিন্তু স্থানীয় খাবার গুরুত্ব সহকারে বানাতে হবে। জ্ঞানপীঠ পুরস্কারপ্রাপ্ত শিবরামজী ধারওয়ার্ডে 'মহারাষ্ট্র সদন'-এ এক কার্যক্রমে এসেছিলেন। সন্ধ্যার কার্যক্রমে তাঁকে স্বাগত জানিয়ে বলা হয়েছিল— এখানে মারাঠি ভাষা, মারাঠি সংস্কৃতি বাঁচিয়ে রাখার জন্য এই মহারাষ্ট্র সদন তৈরি করা হয়েছে। সেই প্রসঙ্গে শিবরামজী বললেন— সকলে এক মারাঠি পরিবারে একত্রিত হয়েছি, কিন্তু ভোজন তৈরি হয়েছে পঞ্জাবি। বলার উদ্দেশ্য হলো, অতিথির জন্য পরিবারের পারম্পরিক ব্যঞ্জন তৈরি করা উচিত। ভারতে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন খাদ্য ব্যবস্থা প্রচলিত। খাবার কেবল স্বাদ নির্ভর নয় বরং স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য করেও বানানো হয়। ব্যঞ্জন তৈরির সময় আঞ্চলিক জলবায়ু ও শরীরের দিকেও লক্ষ্য রাখা হয়। কেরালাতে রান্নায় তেঁতুল ব্যবহার করে, কারণ সেখানে তার প্রয়োজন আছে।

জাতপাতের ঊর্ধ্বে উঠে সম্পর্ক : আত্মীয় পরিজনের বাইরেও অন্য পাঁচ পরিবারে নিরন্তর সম্পর্ক রাখা প্রয়োজন। সুযোগ হলে একে অপরের বাড়ি যাওয়া, সুখ-দুঃখের সহভাগী হওয়া, পরস্পরের পারিবারিক রীতি জানার ইচ্ছা থাকা চাই। এরকম যদি সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে উঠে তা সামাজিক সমরসতার সহায়ক হবে। সমাজে ভ্রাতৃত্ব ভাব ছিল— কীভাবে নষ্ট হলো। সমাজে এই ভাব আপনা হতে আসে না। এই প্রক্রিয়া সতত চালিয়ে রাখার জন্য সমাজ রচনা করা প্রয়োজন। আমরা এব্যাপারে দুর্লক্ষ্য করেছি। দ্বিতীয়ত, কাজের প্রয়োজনে আমরা গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তরিত হয়েছি কিন্তু শহরের পরিবেশে খাপ খাওয়াতে পারিনি। সবাই ভাবে, শহরে এসেছি রোজগারের জন্য, আত্মীয়তা নয়। আধুনিকতা অনুসরণ করা দোষের নয় কিন্তু জীবনের পুরানো ও সঠিক মূল্যবোধ ভুলিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। সমাজের সর্বস্তরের লোকের সঙ্গে সৌহার্দ্য বজায় রাখার মতো সংবেদনা অনুভব করা প্রয়োজন— যা ধীরে ধীরে কমতে দেখা যাচ্ছে। বাহ্যিক সমৃদ্ধির পিছনে ছুটতে গিয়ে এসব হচ্ছে। পরিবারের আকাঙ্ক্ষা অবশ্যই থাকবে— ব্যাংক ব্যালেন্স, ছেলে-মেয়ের উচ্চ শিক্ষা, বিভিন্ন বিনোদনের ব্যবস্থা, আকাঙ্ক্ষা থাকা অনুচিত নয় কিন্তু উচ্চাকাঙ্ক্ষা নয়। বাড়িতে বসে দেখি বড়ো পর্দায় ক্রিকেট খেলা, ছেলেরা মাঠে খেলার যে আনন্দ তা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। খুবই চিন্তার বিষয়। এ ব্যাপারে ভাবতে হবে এবং সামাজিক পরিবর্তনের জন্য সচেষ্ট হতে হবে। বর্তমানে ইন্টারনেট ও অসংখ্য চ্যানেলের মাধ্যমে সারা দুনিয়া হাতের মুঠোয় এসে গেছে। আগে এরকম ছিল না। প্রত্যেক গ্রামের নিজস্ব পরিচিতি ছিল। সেটা ভালো কী মন্দ— সেটা বড়ো কথা নয়, তবে পরিণাম সর্বসাধারণের মধ্যে সংক্রামিত হয়েছে। সকলের সঙ্গে মেলামেশা করেও নিজের পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্য বজায় রাখা উচিত।

পরিবার প্রবোধন : পরিবার ভাবনা অনেকটা লঘু হয়ে যাচ্ছে। পুত্র/কন্যা ঘর থেকে বাইরে চলে যাচ্ছে এবং দৈনিক যোগাযোগ কম হচ্ছে। নিজের সংস্কৃতির প্রতি অজ্ঞানতা ও পরস্পরের প্রতি উদাসীনতার কারণে ধার্মিক হওয়া এবং অন্ধবিশ্বাসের মধ্যে তফাত করতে পারছে না। আজ যে ঘরের ছেলে কাল সে দেশের নাগরিক। তাই প্রত্যেক সন্তানের পরিবারের প্রতি যেমন দায়িত্ব আছে তেমনি দেশের প্রতি আছে। পরিবার প্রবোধন বিষয়ে এতটাই গভীর ব্যাপক চিন্তা করা হচ্ছে।

'স্ব'-ভাবনা : আমাদের দেশ ভারতের একটি পরিচিতি আছে। প্রত্যেক দেশেরই একটা নিজস্বতা আছে। 'স্ব'-এর ভাবনা আছে, জাপানের আছে, ইংল্যান্ডের আছে, ভারতেরও আছে এবং তা দৃশ্যমান।

স্বস্তিকার বিজ্ঞাপনের দরপত্র (এক সপ্তাহের জন্য)

Back Cover	(Multi Colour)	Rs. 32,000.00
Front Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Back Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Full Page	(Multi Colour)	Rs. 20,000.00
Full Page	(Black & White)	Rs. 15,000.00
Half Page	(Black & White)	Rs. 8,000.00
Qtr. Page	(Black & White)	Rs. 4,000.00

** *বিজ্ঞাপনের টাকা জমা পড়লে বিজ্ঞাপন ছাপানো হবে।*

যোগাযোগ — মো : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

প্রত্যেক দেশের 'স্ব'-এর ভাবনায় বিশ্বের প্রতি কর্তব্য আছে। আমাদের পূর্বপুরুষ মুনি-ঋষিরা এখানকার সামাজিক ব্যবস্থা বিকশিত করেছেন। আমরা বলি, মাতৃ দেবো ভবঃ, পিতৃদেবো ভবঃ, আচার্য দেবো ভবঃ, অতিথি দেবো ভবঃ এবং সেইরকম ব্যবহার করি। এটাই ভারতের 'স্ব'। এটাই আমাদের চিন্তন। আমাদের বিশ্বাস, প্রত্যেক প্রাণীই ঈশ্বরের অংশ, এটাই 'স্ব'। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেকের জীবনের সার্থকতা কোনো বস্তু বা ব্যক্তির সঙ্গে জড়িত। আমাদের জীবনের সার্থকতা যার উপরে নিভরশীল তা বুঝে প্রাপ্ত করার চেষ্টা করি। এই ভাবেই মোক্ষলাভ হয়। এটাই ব্যক্তি বিকাশের পথ, এই ভাবনাই আমাদের 'স্ব'। এই দৃষ্টিতেই আমরা প্রকৃতিকে দেখি এবং পরিবার ব্যবস্থা দেখি। আমাদের বিজ্ঞান, সংগীত, কলাও এই আধারে বিকশিত হয়েছে। আমাদের সংস্কৃতি 'স্ব'-এরই অভিব্যক্তি। এটাই সারা বিশ্বে আমাদের পরিচয়। একজন প্রবীণ স্বয়ংসেবক তাঁর পত্নীকে সঙ্গে নিয়ে সমুদ্রের ধারে বেড়াচ্ছিলেন, পত্নীর পরনে শাড়ি, সিঁথিতে সিঁদুর লাগানো ছিল— একজন বিদেশি মহিলা ভাষা না জেনেও তাঁদের দেখে— ভারতীয় বলে সম্বোধন করলেন। অর্থাৎ ভাষা না জেনেও বিদেশি মহিলা বেশভূষা দেখে ভারতীয় বলে চিনতে পারলেন। এই ভাবেই আমাদের 'স্ব' প্রকট হয়। এরকম অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। আধুনিক জীবনে প্রবেশ করতে হলে পুরানো সবকিছু ত্যাগ করার প্রয়োজন নেই। সময়ের সঙ্গে তাল রেখে যুগানুকূল করতে হয়। 'স্ব'-এর ভাবনা যদি পুস্তক বা সংগ্রহশালায় আবদ্ধ হয়ে যায়, দৈনিক জীবনে প্রকটিত না হয় তবে এর কোনো অর্থ হয় না। তাই দৈনন্দিন জীবনে 'স্ব'-এর প্রকাশ হওয়া চাই।

আর্থিক স্বত্ব : অর্থনৈতিকভাবে আত্মনির্ভর হওয়া কোনো দেশের পক্ষে স্বাভিমানের আর একটি দিক। দেশ পার্থিব সম্পদে সমৃদ্ধ হবে, তার জন্য আর্থিক সমৃদ্ধি জরুরি। এটা দেশের জন্য, দেশের নাগরিকদের জন্যও জরুরি। যদি দেশের প্রত্যেকটি মানুষ অন্ন-বস্ত্র- বাসস্থানের দ্বারা সুখী হয়, তাহলেই তারা ঠিকভাবে মানবোচিত আচরণ করতে পারবে। ভারতীয় সংস্কৃতিতে আর্থিক সমৃদ্ধির দিকটিকে উপেক্ষা করার শিক্ষা দেওয়া হয়নি। চার পুরুষার্থের মধ্যে 'অর্থ' একটি। এজন্য অর্থেরও গুরুত্ব রয়েছে। আচার্য চাণক্য বলেছেন— 'ধর্মস্য মূলং অর্থম্'। তাই আর্থিক সমৃদ্ধি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

হাজার বছরের সংঘর্ষ ও পরাধীনতার সময়ে ভারত লুণ্ঠিত হয়েছে। আর্থিকভাবে দুর্বল হয়েছে। এটা দূর করা প্রয়োজন। এটা কেবল সরকারি বাজেট বৃদ্ধি অথবা সরকারের আর্থিক যোজনার দ্বারা হবে না। সবাই মিলে দেশকে সমৃদ্ধ করার ভাবনা সমাজের মধ্যে উৎপন্ন করতে হবে। সকলকে নিশ্চিত করতে হবে যে, পরিশ্রমের কোনো বিকল্প নেই।

যুব সমাজের মনের অন্তর্নিহিত কৌশলকে বিকশিত করা প্রয়োজন। এরকম যোজনা তৈরি করতে হবে। সমাজের রক্ষার জন্যও আর্থিক সমৃদ্ধির প্রয়োজন। ভারতীয় সংস্কৃতিতে বলা হয়েছে, সমাজে দেওয়ার জন্য আমরা উপার্জন করি। বলা হয়েছে, শত হাতে উপার্জন আর হাজার হাতে বিতরণ।

স্বদেশীর দ্বারাই সমৃদ্ধি : স্বদেশীর জীবনশৈলীর মধ্যে আর্থিক সমৃদ্ধির বিষয়টি নিহিত রয়েছে। সেজন্য আমাদের স্বদেশী দ্রবের ব্যবসাকে উৎসাহিত করা এবং সক্রিয় ভাবে স্বদেশী দ্রব্য নিজেদেরও ব্যবহার করতে হবে। তা গ্রামীণ বা কুটির শিল্প হোক না কেন। গ্রামীণ ও কুটির শিল্পে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার করে ভালোভাবে বাজারের চেষ্টা করা উচিত। চীন করতে পারে, জাপান করতে পারে, কোরিয়া স্বদেশীপথে তাদের আর্থিক সমৃদ্ধি আনতে পারে, তাহলে ভারত কেন পারবে না? এরকম না করতে পারলে ভারতের বাজার অন্যেরা দখল করবে। চীনের তৈরি ঠাকুর দেবতার প্রতিমায় আমাদের বাজার ছেয়ে গিয়েছে। আমাদের এর অর্থ এবং গম্ভীর পরিণামকে বুঝতে হবে।

এক সময় ভারতে প্রতিটি জেলায় শাড়ি ও ধুতির মতো উৎকৃষ্ট কাপড় তৈরি হতো। কিন্তু এইসব কাপড় এখন বড়ো বড়ো মিলে তৈরি হচ্ছে। এর ফলে কাপড়ের দাম সস্তা হয়ে গিয়েছে কিন্তু গ্রামের লোকেরা কর্মহীন হয়ে পড়েছে। এই সব কাপড় এখন বিদেশি কোম্পানির হাতে চলে গিয়েছে। ইংরেজ আমাদের দেশ থেকে চলে গিয়েছে, কিন্তু বিদেশি কোম্পানি আমাদের বাজার দখল করে নিয়েছে। আমাদের দেশের টাকা বাইরে চলে যাচ্ছে। এর ফলে দেশের আর্থিক সমৃদ্ধি কীভাবে আসবে? তাই দেশকে সমৃদ্ধ করতে হলে দেশবাসীকে স্বদেশী জীবনশৈলী করতেই হবে। স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারও 'স্ব'-এর অভিব্যক্তি প্রকাশের অন্যতম দিক।

(লেখক রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরকার্যবাহ)

শোক সংবাদ

বর্ধমান জেলার স্বয়ংসেবক তথা ক্রীড়া ভারতী মধ্যবঙ্গ প্রান্তের কোষাধ্যক্ষ দেবব্রত সাঁইয়ের মা মঞ্জু সাঁই গত ৯ নভেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। তিনি ২ পুত্র, পুত্রবধূ ও ২ নাতি রেখে গেছেন।

* * *

উত্তর বীরভূম জেলার কলেশ্বর খণ্ডের কার্যবাহ সন্দীপ মণ্ডলের ঠাকুমা মায়ারানি মণ্ডল গত ২১ অক্টোবর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বস হয়েছিল ৮২ বছর। তিনি ২ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র বৌদ্ধিক প্রমুখ বলরাম দাসরায়ের অগ্রজ মণীন্দ্রনাথ দাস গত ২২ নভেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ১ পুত্র, ১ নাতনি এবং পরিবার পরিজন রেখে গেছেন।

যুগের আহ্বান

হিন্দুদের সংগঠিত হওয়া ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই

হিন্দুর হয়ে কেউ লড়তে আসবে না। নিজের পরিবার-পরিজন, স্ত্রী-কন্যার সম্মান রক্ষায় নিজেদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। মাত্র ৩৫ শতাংশ একটি সম্প্রদায় যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, তবে ৬৫ শতাংশ হিন্দু তা পারবে না কেন?

শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী

কথায় আছে সাপের লেজে পা দিলে নাকি ছোবল খেতে হয়। বাঙ্গালি হিন্দু আজ ছোবল দেওয়া তো দূর, ফোঁস করতেও ভুলে গেছে। মাসখানেক আগে কাকদ্বীপের হারউড পয়েন্টে উত্তর চন্দ্রনগর গ্রামে কালীপূজা মণ্ডপ থেকে কে বা কারা মা কালীর মাথা কেটে নিয়ে চলে গেল। ফোঁস করেছিল বাঙ্গালি? না, করেনি। পুলিশ এল। উত্তেজনা না ছড়ানোর অজুহাতে মস্তকবিহীন কালীমূর্তিকে প্রিজন ভ্যানে তুলে নিয়ে গেল। হিন্দুরা তখনো ফোঁস করেনি। হিন্দুরা সোশ্যাল মিডিয়া, চা দোকান, পাড়ার রকে বসে 'বেগমের রাজত্ব' বলে গালাগালি দিল। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ কি করছে প্রশ্ন তুলল, বিজেপি কেন পশ্চিমবঙ্গকে অচল করছে না তার হিসেব চাইল। কেন্দ্র হস্তক্ষেপ করছে না বলে চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় তুলল, কিন্তু একবার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে প্রশ্ন করল না, আমার ধর্মের অপমানের বিরুদ্ধে আমি কী করলাম? এর ক'দিন আগেই উত্তর চব্বিশ পরগনার ঘুনি গ্রামে জেহাদিরা কালীপূজা না করার ফতোয়া দিয়েছিল। এই জেলায় কয়েকশো ক্লাব। কটি এর প্রতিবাদ করেছিল? সক্রিয় না হোক, কমপক্ষে কালীমণ্ডপের গেটে কালো কাপড়ে এক লাইনের একটি প্রতিবাদ বাক্য? না, লিখে টাঙায়নি। এক লক্ষ দশ হাজারের অকশানে নিজেদের যারা বিক্রি করে দেয় তারা কী করে আশা করে তাদের মণ্ডপে মাতৃপ্রতিমা অক্ষত থাকবে? সামান্য উচ্ছিষ্টের লোভে যারা নিজের ধর্মের ওপর ঘটে চলা আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে ভুলে যায় সেই বাঙ্গালির তো এটাই প্রাপ্য।

এই রাজ্যে ভোট ভিখারি রাজনৈতিকদলগুলি ছলে-বলে- কৌশলে হিন্দুদের ভাগ করে রাখতে যায়। সেই ফাঁকে পড়ে নির্বোধ হিন্দুরা সংখ্যায় ৭০ শতাংশ হয়েও বিভিন্ন দলে বিভক্ত। বিপরীতে মুসলমানরা ভোট ভাগাভাগি করে না। তারা ভাতা, ভরতুকি, দেশ, রাজ্য, সমাজ দেখে নয়, মজহবের স্বার্থ দেখে ভোট দেয়। তাই ৩০ শতাংশ মুসলমান চোখ বন্ধ করে নিজের পছন্দের লোকেদের ভোট দিয়ে জিতিয়ে নিজেদের পছন্দের সরকার তৈরি করে নেয়।

পশ্চিমবঙ্গে অনুপ্রবেশ সমস্যা কমপক্ষে ৫-৬ দশকের। এ কেবল জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা নয়। অনুপ্রবেশ হলো বিনাযুদ্ধে ভারত দখলের চক্রান্ত। কিন্তু এই সরল সত্যটা আজও বাঙ্গালি বুঝে উঠতে পারেনি। অনুপ্রবেশকারীরাই আজ রাজ্য সরকার তৈরির নির্ণায়ক শক্তি। সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসন আইনকানুন সবের নির্ধারক। একথা আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও ২০ বছর আগে বলেছিলেন। ২০০৫ সালে লোকসভায় দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য অনুপ্রবেশের তথ্য সংবলিত কাগজ স্পিকারের দিকে ছুঁড়েও মেরেছিলেন। তারও আগে জনতা দল সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সিপিএম নেতা ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত লোকসভায় দাঁড়িয়ে স্বীকার করে বলেছিলেন যে এদেশে এক কোটিরও বেশি অনুপ্রবেশকারী আছে। কিন্তু ভোটভিখারি দলগুলি এবং তাদের নেতা-নেত্রীরা আজ অনুপ্রবেশকারীদের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন। এদের উৎসাহেই পশ্চিমবঙ্গ ধীর ধীরে জেহাদিদের স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠছে।

কোথাও বাংলাদেশের বাসিন্দা লাভলী খাতুন শাসকদলের কাউন্সিলার সেজে বসে আছে, রংপুরের মইনুদ্দিন মালদায় এসে নাম পালটে হয়ে গেছে পলাশ অধিকারী, ওপারের নুরুল হক দত্তপুকুরে এসে সেজে গেলেন নারায়ণ অধিকারী, ঢাকার আকিল পশ্চিমবঙ্গে এসে অখিল হয়ে গেছে। আবার কোথাও-বা বাংলাদেশি জেহাদি ইখতিয়ার নিশ্চিন্তে মুর্শিদাবাদে বসে লস্কর-জইশ-আনসারুল্লা বাংলা টিমের জেহাদি নেটওয়ার্কের সঙ্গে মিলে দিল্লিতে বোমা বিস্ফোরণের পরিকল্পনা করছে। গত দেড় দু-দশকে আমাদেরই ঘরের দোরগোড়ায় রাজনগরে গড়ে উঠেছে অনুপ্রবেশকারীদের কলোনি। কুলপির বাবুর মহলে তৈরি করে ফেলছে জামাই পাড়া, নিউ টাউনে গড়ে তুলেছে মাসুদ বস্তি, দক্ষিণ কলকাতার উপকণ্ঠে গজিয়ে উঠেছে গুলশান কলোনি। বাংলাদেশের ফাইমা আক্তাররা মাত্র আট-দশ বছর ক্যানিং এসে পাঁচটি-সাতটি করে বাচ্চা জন্ম দিয়ে সরকারি জমিতে তৈরি করে ফেলেছে বাংলাদেশি বস্তি। বসিরহাট থেকে গ্রেপ্তার হওয়া তানিয়া পরভিন দমদম জেলে বসে যোগাযোগ রাখছে কুখ্যাত জঙ্গি মাসুদ আজহারের বোন সইদা আজহার এবং দিল্লি বিস্ফোরণের চক্রী শাহিন সইদের সঙ্গে। এরা রাজ্যের শান্তিশৃঙ্খলা ও হিন্দুদের কাছে একটা থ্রেট।

অথচ নির্বাচন কমিশন যেই এসআইআর-এর মাধ্যমে এদের চিহ্নিত করে ভোটার তালিকা থেকে নাম ছেঁটে ফেলার কাজ শুরু করেছে অমনি এদের বাঁচাতে সেকু-মাকু সকলে একযোগে এসআইআর-এর বিরোধিতায় নেমেছে। এসআইআর না হলে মানুষ জানতেই পারত না ঠিক কত লক্ষ রহমত আলি বাংলাদেশ থেকে এপারে এসে ডোমজুড়, মধ্যমগ্রাম, সোনারপুরে এসে শ্বশুরকে বাবা আর শ্বাশুড়িকে মা বানিয়ে ভোটার তালিকায় নাম তুলে নিয়েছে। অথবা কত হাজার ইকবাল কাদরী বছরের পর বছর রামকৃষ্ণ সারস্বত সেজে এদেশে 'গজওয়াতুল হিন্দ'-এর স্বপ্নকে সাকার করতে কাজ করে চলেছে।

শাসক দল এদেরই বাঁচাতে স্লোগান তুলেছে 'আমরা সবাই বাঙ্গালি। তাই কাউকে কাগজ দেখাবো না'। মামার বাড়ির আবদার! একটা হোটেলে এক ঘণ্টা কাটাতেও পরিচয়পত্র দেখাতে হয়। আর একটা দেশে গুষ্টিসুদ্ধ

ফঃ ২

থাকবে অথচ কাগজ দেখাবে না? নিজের জমিতে প্রতিবেশী এক ফুট ঢুকে গেলে লাঠিসোঁটা নিয়ে লড়াই শুরু হয়ে যায়। আর পশ্চিমবঙ্গে দেড়-দু' কোটি রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারী অবৈধভাবে দেশ দখল করে বসে আছে তার বেলায় বলছে কাগজ দেখাব না, এসআইআর-ও করতে দেবো না। ক'দিন আগে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী মিয়ানমার থেকে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকে তুলনা করলেন বর্মা থেকে আজাদ হিন্দ ফৌজের ভারতে প্রবেশের সঙ্গে। তিনি বললেন, 'রোহিঙ্গাদের আসার পথ আর বর্মা থেকে আজাদ হিন্দ ফৌজের ভারত আসার পথ এক'। অর্থাৎ রোহিঙ্গা মুসলমান ও আইএনএ সমান! শুধু কী তাই? যে মতুয়া সম্প্রদায় একসময়ে বাংলাদেশের মুসলমানদের অত্যাচার থেকে বাঁচতে দলে দলে এই পশ্চিমবঙ্গে এসে ঠাঁই নিতে বাধ্য হয়েছিল, শাসকদলের ধামাধারী তাদেরই একটি গোষ্ঠী আজ সেই অত্যাচারী জেহাদিদের পাশে দাঁড়িয়েছে। ভোটার তালিকা থেকে জেহাদিদের নাম কেটে দেওয়ার বিরোধিতা করছে। এসআইআর-এর বিরুদ্ধে পথে নেমেছে, আমরণ অনশনে বসেছে।

ইংরেজিতে একটি কথা আছে— 'হিস্ট্রি রিপিটস্ ইটসেলফ্'। ১৯৪৭-এর আগে অবিভক্ত বঙ্গের একটি জেলা ছিল সিলেট, যা দেশভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানে চলে গিয়েছিল। সিলেটের মেজরিটি পপুলেশন ছিল হিন্দু। সেসময় ভোটের মাধ্যমে ঠিক করার কথা ছিল সিলেট অসমের অংশ হয়ে ভারতে থাকবে, না পূর্ব পাকিস্তানে চলে যাবে। সিলেটে তপশিলি হিন্দু ছিল সবচেয়ে বেশি। তাদের নেতা ছিলেন যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডল। তিনি পরে পাকিস্তানের প্রথম আইনমন্ত্রী হয়েছিলেন। আজকাল যেমন সারা দেশের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গেও 'মতুয়া-মুসলিম ঐক্য' নাম একটি গালভরা শব্দ শোনা যায়, সে সময়ও ঠিক তাই ছিল। যোগেন মণ্ডল বলেছিলেন তাঁর সঙ্গে জিন্নার কথা হয়েছে নমশূদ্ররা মুসলিম লিগের সঙ্গে থাকবে, ওদের পূর্ব পাকিস্তানে চলে যাব। নির্বাচনের সময় তিনি তার জাতের ভোট মুসলিম লিগের পক্ষে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। নমশূদ্র সমাজও যোগেন মণ্ডলের কথায় প্রভাবিত হয়ে তাদের সব ভোট মুসলিম লিগকে দিল। হিন্দু ভোট ভাগ হলো। সংখ্যা তত্ত্বে সিলেট পাকিস্তানে যাওয়া নিশ্চিত হয়ে গেল।

১৯৪৭ সালে দেশভাগ হলো। সিলেট গেল পূর্ব পাকিস্তানে। যোগেন মণ্ডল হলেন পাকিস্তানের প্রথম আইনমন্ত্রী। ঠিক তিন বছরের মাথায়, ১৯৫০ সালে সেই সিলেট-সহ গোটা পূর্ব পাকিস্তান জুড়ে শুরু হলো ব্যাপক হিন্দুহত্যা। বাদ গেল না নমশূদ্ররাও। এসসি, এসটি-সহ সমস্ত হিন্দুর ঘরে ঘরে লাগানো হলো আগুন। পুরুষদের হত্যা করা হলো, মহিলারা ধর্ষিতা হলো। হিন্দুর সামনে দুটি পথই খোলা ছিল, হয় মুসলমান হয়ে যাও, নয়তো মৃত্যু বেছে নাও। সেদিন যোগেন মণ্ডল তার জাতভাইদের বাঁচাতে জিন্নার হাতে পায়ে ধরেছিলেন, কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। শেষ পর্যন্ত যোগেন মণ্ডল প্রাণ বাঁচাতে তার জাত ভাইদের ওপারে ফেলে রেখে রাতের অন্ধকারে ড. শ্যামাপ্রসাদের তৈরি এই হিন্দু-পশ্চিমবঙ্গে চলে এলেন। বর্তমান পরিস্থিতি দেখে মনে হয় ইতিহাস থেকে মতুয়া সমাজ কোনো শিক্ষাই নেয়নি। এদেশে জয়চাঁদ থেকে শুরু করে যোগেন মণ্ডল, যারাই জেহাদিদের সঙ্গ দিয়েছে তাদের অন্তিম পরিণতি কি তা তারা ভুলে গেছে? তাই আজকের যোগেন, জয়চাঁদরা সেই ইংরেজি আপ্তবাক্যটি সফল করতে উঠে পড়ে লেগেছে।

১৯২০ সালে যদি পূর্ববঙ্গে বাস করা কোনো হিন্দুকে বলা হতো কুড়ি বছরের মধ্যে এদেশ ভাগ হয়ে পাকিস্তান হয়ে যাবে, তবে তারা এই কথা শুনে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করত। যদি ১৯৫০ সালে পূর্ব পাকিস্তানের কোনো হিন্দুকে বলা হতো কুড়ি বছরের মধ্যে তাকে সব হারিয়ে উদ্বাস্তু হয়ে ভারতে পালিয়ে যেতে হবে তবে তিনি সে কথা শুনে ঠাট্টা তামাশা করত। আর আজ ২০২৫, কাউকে যদি বলা হয় পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা এভাবে চলতে থাকলে আগামী ২৫ বছরের মধ্যে বাঙ্গালি হিন্দুকে নিজের মা-বোন আর ধর্ম বাঁচাতে পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে পালাতে হবে তবে নিশ্চিত যে, সেও হাসাহাসি করবে। তবে বিশ্বাস হোক বা নাই হোক এটাই বাস্তব। গত কয়েক বছরে পশ্চিমবঙ্গের ঘটনাক্রম সে ইঙ্গিতই দিচ্ছে। ক্যানিং, উস্তি, বাদুড়িয়া, ধুলাগড়, বেলডাঙ্গা, শ্যামপুর, মহেশতলা, সামশেরগঞ্জ এর সাক্ষী। ১৯৪৭-এ পূর্ববঙ্গে হিন্দুর সংখ্যা ছিল ৩০ শতাংশ, আজ সাত। হিন্দুরা সে দেশে ধীরে ধীরে নিশ্চিহ্ন হওয়ার পথে। আর এপার পশ্চিমবঙ্গে? দেশভাগের সময় হিন্দু ছিল ৮০ শতাংশ, আজ ৬৫ শতাংশ। দ্রুত কমছে। এভাবে চললে আগামী ২৫ বছর পরে এই পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুরা সংখ্যালঘু হয়ে যাবে।

তবে বাঁচার পথ কী? আমাদের পূর্বপুরুষেরা সেই রাস্তাও দেখিয়ে গেছেন। বৈদিক যুগে সমাজকে একতাবদ্ধ করার জন্য রচিত হয়েছিল 'সংগচ্ছধ্বম্ সংবদধ্বম্' মন্ত্র। আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে সমাজকে এক করার জন্য ভগবান বুদ্ধ বলেছিলেন 'সঙ্ঘম্ শরণং গচ্ছামি'। আজ থেকে ৫৫০ বছর আগে হিন্দু সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য শ্রীচৈতন্যদেব বলেছিলেন 'সঙ্ঘ শক্তি কলিযুগে'। আজ থেকে দেড়শো বছর আগে স্বামী বিবেকানন্দ তার স্বদেশ মন্ত্রে বলেছিলেন, 'মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার রক্ত আমার ভাই'। আজ থেকে শতবর্ষ আগে যুগাচার্য প্রণবানন্দজী মহারাজ বলেছিলেন, 'হিন্দুর বিদ্যা আছে, বুদ্ধি আছে, অর্থবলও আছে, নাই শুধু সংগঠিত শক্তি। এই শক্তি জাগাইয়া দিলে হিন্দু বিশ্বে অজেয় হইয়া যাইবে'। আজ থেকে একশো বছর আগে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার বলেছিলেন 'আমাদের এমন সংগঠিত হতে হবে যাতে হিন্দুদের দিকে বাঁকা চোখে কেউ তাকাতে সাহস না পায়'।

মহাপুরুষদের এই বাণীকে ফলিত রূপ দেওয়ার সময় এসেছে। বিধর্মীর লাথি ঝাঁটা খেয়ে ওপার থেকে এপারে পালিয়ে এসে হতভাগ্য উদ্বাস্তু হিন্দু মনে রেখেছে ওপারে বিঘে বিঘে জমির কথা, সারিসারি সুপারি বাগানের গল্প, পদ্মার ইলিশের কথা; শুধু মনে রাখেনি কেন এত কিছু ছেড়ে উদ্বাস্তু হয়ে চলে আসতে হলো। এই আত্মঘাতী হিন্দুকে বাঁচাবে কে? বাঙ্গালি হিন্দু আগে ঠিক করুক সে বাঁচতে চায় না মরতে চায়? বাঁচতে হলে হিন্দুকে সংগঠিত হতে হবে। কোনো বিজেপি, আরএসএস, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ তাকে বাঁচাতে পারবে না। মহাভারতের যুদ্ধ এক মুহূর্তে শেষ হয়ে যেত যদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজের হাতে অস্ত্র তুলে নিতেন। তা হয়নি। তিনি বুঝিয়েছিলেন এটা ধর্মযুদ্ধ। নিজের যুদ্ধ নিজেকেই লড়তে হয়। আজ হিন্দুর হয়ে কেউ লড়তে আসবে না। নিজের পরিবার-পরিজন, স্ত্রী-কন্যার সম্মান রক্ষায় নিজেদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। মাত্র ৩৫ শতাংশ একটি সম্প্রদায় যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, তবে ৬৫ শতাংশ হিন্দু তা পারবে না কেন? হিন্দুর ভবিষ্যৎ, হিন্দুর সন্তান-সন্ততির ভবিষ্যৎ হিন্দুর হাতেই। সংগঠিত শক্তিই হলো একমাত্র মুক্তির উপায়। এটাই যুগের আহ্বান। □

একদেশ, একজাতি ও এক সংস্কৃতি— ভারতের বৈশিষ্ট্য

সত্যনারায়ণ মজুমদার

সমান মাতৃভূমি, সমান সমাজ ও সমান সংস্কৃতি হলো জাতি গঠনের ভিত্তি। মানব সভ্যতার বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে মানব সমাজ প্রকৃতি নির্ভর হয়ে বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন স্থানে অস্থায়ীরূপে কালাতিপাত করতো। ফলে কোনো ভূমির প্রতি তাদের শ্রদ্ধা, আস্থা বা স্বাভিমান সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু ভারতের মানুষ ছিল এই অবস্থার ব্যতিক্রমী। প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য থেকে সামাজিক ঐক্যের পথে যাত্রার যে পদ্ধতি তা প্রত্যেক সমাজের ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকলেও বিশ্বের কিছু পণ্ডিত ব্যক্তি সর্বমান্য কিছু সূত্র সৃষ্টি করেন তা হলো, ঐতিহাসিক বিকাশক্রমের পর্যায়ে যেখানে যেখানে Tribalism ও Territorialism -এর সমকালীন সংযোগ সৃষ্টি হয়েছে সেখানে জাতীয়তার উদ্ভব হয়েছে।

কোনো ব্যক্তি সমূহের (জনগোষ্ঠী) কোনো ভূখণ্ডের সঙ্গে একাত্মতা সৃষ্টির জন্য তাদের সুদীর্ঘ সাহচর্যের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কেবল সাংবিধানিক শর্ত, আইন ব্যবস্থা, শাসন, সংসদীয় প্রস্তাব ইত্যাদির দ্বারা এই একাত্মতা সৃষ্টি সম্ভব নয়। কারণ ঐক্য হলো মনোবৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। ভারতের মানুষ সৃষ্টিলগ্ন থেকেই এই ভূমিতে বসবাস করে আসছে এবং ভৌগোলিক কারণে তারা যাযাবর ছিল না। এই ভূমির সঙ্গে ভারতবাসী সভ্যতার বিকাশের ঊষালগ্ন থেকেই একাত্ম হয়েছে। ভারতে আর্য আগমনের পাশ্চাত্য ধারণাকে খণ্ডন করে ডঃ বাবাসাহেব আম্বেদকর বলেছেন---‘‘The language in which reference to the seven rivers is made in the Rigveda is very significant. No foreigner would ever address a river in such familiar and endearing terms as ‘My Ganga’, ‘My Saraswati’ unless by long association he had developed an emotion about it.’’

অথর্ববেদের কথাই আম্বেদকর প্রকাশ করেছেন। অথর্ববেদে রয়েছে— ‘মাতা ভূমিঃ পুত্রোঽহং পৃথিব্যা’ অথবা ‘ভূমে মাতর্নি ধেহি মা ভদ্রয়া সুপ্রতিষ্ঠিতম্’।

ভারতভূমির সঙ্গে এখানকার মানুষের একাত্মতা তাই অতি প্রাচীন। হাজার আক্রমণের পরও তা সমানভাবে বিদ্যমান। কারণ অত্যাচার দেশভক্তিকে বা জাতীয় নিষ্ঠতাকে বিনষ্ট করতে পারে না। এই বিষয়ে বার্নার্ড জোসেফ তাঁর Nationality গ্রন্থে লিখেছেন— Oppression of Group does not itself transform it into nationality....।’ ভারতের জাতীয়তা সেই জন্য পাশ্চাত্য প্রভাব মুক্ত রয়েছে। দেশের প্রতি ভারতীয়দের আনুগত্যের কথা স্বীকার করে রমেশচন্দ্র দত্ত লিখেছেন—‘The loyality of India to her past is a puzzle to outsiders. The unique phenomenon presented in India of a living stream of Ancient faith and tradition....’.

দেশের প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি ও আনুগত্য সৃষ্টির জন্য আমাদের পূর্বপুরুষগণ, ঋষি, মুনি, আচার্য, মহাপুরুষ, সমাজসংস্কারক, কবি, সাহিত্যিকগণ সমগ্রদেশ ভ্রমণ করে প্রাচীন গ্রন্থের শিক্ষণীয় বিষয়গুলিকে বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করে, সেগুলির প্রচারের মাধ্যমে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠনের মাধ্যমে সমগ্র দেশবাসীকে সুশিক্ষিত ও সংস্কারিত করে নিত্য সাধনায় ব্রতী করেছেন। যুগে যুগে ভারতকে শ্রেষ্ঠ আসনে বসানোর জন্য প্রেরণাদায়ী বাক্যও তাঁরা প্রচার করেছেন। রামায়ণ

যুগে এই বাক্য ছিল—'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'। মহাভারত যুগে প্রচলিত হয়— 'মাতাগুরুতরা ভূমেঃ'—পুরাণ যুগে দেশমাতৃকার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি সৃষ্টির জন্য ভারতবাসী শয্যাত্যাগ থেকে শয্যাগ্রহণ পর্যন্ত দেশমাতার কথা নিত্য স্মরণ করেছে। বলা হতো 'বিষ্ণুপত্নী নমস্তুভ্যং পাদস্পর্শং ক্ষমস্ব মে'। শয্যা গ্রহণের সময় ভারতবাসী উচ্চারণ করতো 'সর্বপে দেবী ..... সুখ নিদ্রাং দেহিমাতঃ নমামি ত্বং পুনঃপুনঃ'। পূজাপাঠের মাধ্যমে স্মরণ করা হতো দেশমাতৃকাকে—পৃথ্বীত্বয়া ধৃতা লোকা দেবীঞ্চ বিষ্ণুনা ধৃতা, অথবা গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরী সরস্বতী....ইত্যাদি। পুরাণ সাহিত্যে লেখা হয়েছে—গায়ন্তি দেবাঃ কিল গীতকানি....। আধুনিক কালে এই দেশভক্তি ব্যক্ত হয়েছে 'বন্দে মাতরম্' সংগীতে।

দেশের সামগ্রিক সীমার বর্ণনা করে ভারতের পূর্বপুরুষগণ সমগ্র দেশবাসীর কাছে দেশমাতৃকার মূর্ত প্রকাশ ঘটিয়েছেন। বেদে বলা হয়েছে---সমুদ্র পর্যান্তায়া একরাট.....। তেমনি পুরাণ সাহিত্য লিখছে—উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্...। তন্ত্রশাস্ত্রের বর্ণনা— 'হিমালয়ং সমারভ্য যাবদিন্দু সরোবরম্'। মনুর কথায়, যোজনা সহস্র পরিমাণং তির্যক চক্রবর্তী ক্ষেত্রম্—এই সমস্ত বর্ণনার মাধ্যমে অখণ্ড দেশমাতৃকার কল্পনা অতি সুস্পষ্ট হয়েছে ভারতীয়দের মনে।

সমগ্র সম্পূর্ণ ভারতবর্ষকে সাক্ষাৎ দর্শনের জন্য আমাদের পূর্বপুরুষগণ তৈরি করেছেন মঠ, মন্দির, তীর্থস্থান, পীঠস্থান ইত্যাদি। যেগুলিকে দর্শন করাকে পুণ্য হিসেবে বিবেচনা করে সমগ্র ভারত ভ্রমণ ভারতবাসীর কাছে হয়েছে অবশ্যকর্তব্য। সমগ্র দেশ বিষয়ে একাত্ম ভাবনা সৃষ্টির জন্য দেশব্যাপী প্রচলিত হয়েছে সমান আচারপদ্ধতি, স্মরণ, মনন, পূজাপাঠ, ধর্মীয় ও সামাজিক কার্যকলাপ, বিভিন্ন মেলা ও স্নানযাত্রার পর্ব। সর্বক্ষেত্রে সমগ্র ভারতবাসীর হয়েছে সম্মেলন। ফলে মিটে গেছে সমস্ত বিভেদ ও বৈষম্য। দেশমাতৃকা ভারতবাসীর কাছে হয়েছে দেবীস্বরূপা, দেবভূমি ও পুণ্যভূমি। এই দৃষ্টিতে ভারতভূমি এক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নয়, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক অধিষ্ঠান। বিপ্লবী বিনায়ক দামোদর সাভারকর তাঁর রচিত 'Hindutva : Who is a Hindu?' গ্রন্থে তাই লিখেছেন—''The Hindu regards India not only as a political unit... nay, the Hindu regards India as the Goddess mother of his spiritual culture, as the land of his Fathers... he made India the symbol of his culture, the object of his sincerest and deepest worship...''

ভারতমাতার পূজা, দেশমাতৃকার প্রতিকৃতির প্রদর্শন, দেশের জন্য সর্বস্ব ত্যাগের সংকল্প বর্তমানেও অখণ্ড ভারতেরই সাধনার প্রমাণ।

এক রাষ্ট্র বা এক সমাজ— দেশের প্রতি একাত্ম ভাবনা থেকেই ভারতীয় সমাজও হয়েছে একাত্ম। সামাজিক ঐক্য সৃষ্টির জন্য প্রাচীন ঋষি মুনিদের তপস্যাকালে এক 'ভদ্র ইচ্ছা' জাগ্রত হয়। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ সাধনই হলো এই ভদ্র ইচ্ছা। এই কল্যাণের আধার হলো ব্যষ্টি ও সমষ্টি। সমাজের উপাদান ব্যক্তিকে সমষ্টির সঙ্গে বা সামগ্রিক সমাজের সঙ্গে একাত্ম করার জন্য আমাদের পূর্বপুরুষগণ সর্বদা সজাগ ছিলেন। ফলে ব্যক্তি জীবনদর্শন এবং সামাজিক জীবনদর্শন ভারতে হয়েছে একরূপ। সম ও অজ এই দুই শব্দের মিলনে গঠিত হয়েছে সমাজ। অজ শব্দের অর্থ হলো গতি। লক্ষ্য পূরণের জন্য এই গতি যখন সামগ্রিক জনতার মধ্যে সৃষ্টি হয় তখন সমাজ হয় কল্যাণকারী। সামগ্রিক কল্যাণের লক্ষ্যপূর্তির জন্য ব্যক্তির মধ্যে মূল্যবোধ সৃষ্টির প্রয়াস হয়েছে ভারতে যাকে বলা হচ্ছে 'ধর্ম'। ধর্মের মধ্যেই রয়েছে সৃষ্টিতত্ত্ব, রাজ্য, ঈশ্বর, সম্পদ প্রভৃতির বোধ। সৃষ্টিতত্ত্বের ভাবনাতে ভারতবাসী শিখেছে যে সর্বত্র চেতন সত্তার রয়েছে অধিষ্ঠান— 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্'...। সৃষ্টির কোনো কিছুই উপেক্ষণীয় নয়, সকলের রয়েছে সমানাধিকার, নেই কোনো ভেদাভেদ। ঈশ্বর প্রত্যেকের জন্য যতটুকু সম্পদ বণ্টন করেছেন ততটুকুতেই প্রত্যেক মানুষের অধিকার রয়েছে ভোগের জন্য—'তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জিথা...'। প্রত্যেকের মধ্যে সমান চেতন শক্তি থাকার বোধের কারণেই সমাজে সৃষ্টি হয়েছে ঐক্য চেতনা, পারস্পরিক অনুকূলতা ও সহযোগিতা। মাতৃভূমির সকলেই হলো সন্তানসন্ততি। ফলে প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের সম্পর্ক হলো ভাই-বোনের মতো।

প্রত্যেককে প্রত্যেকের কল্যাণ সাধনে ব্রতী হতে হবে, তার ফলে সমাজ হবে—'সর্বে বৈ সুখিনঃ সন্তু সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ'। প্রত্যেকের মনোভাবনার পার্থক্য অনুভব করে এক সামঞ্জস্যপূর্ণ বিভেদহীন সমাজ গঠনের জন্য শিক্ষা হলো 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি'। ব্যক্তির এই চেতনার বিকাশের সর্বশেষ পরিণতি হলো, সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে আপনত্ববোধ—'স্বদেশভুবনত্রয়ম্' বা বসুধৈব কুটুম্বকম্।

আবহমানকাল থেকে হিন্দু সমাজের এই বন্ধন নিত্যক্রিয়া, পূর্বপুরুষদের স্মরণ, পূজাপদ্ধতি ও সামাজিক ষোড়শ সংস্কারের মাধ্যমে অব্যাহত রয়েছে। সমাজকে ভারতবাসী পুরুষরূপে দর্শন করেছে। ফলে সমাজের সেবাকেই দেব সেবা হিসাবে গ্রহণ করেছে ভারতবাসী।

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্‌বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
ঊরু তদস্য যদ্‌বৈশ্যঃ পদ্‌ভ্যাং শূদ্রোঽজায়তঃ।

(ঋগ্বেদ : ১০।৯০।১২)

অর্থাৎ চতুর্বিধ ব্যবস্থাসম্পন্ন সমাজ হলো হিন্দুদের কাছে স্বয়ং বিরাট পুরুষ বা শ্রীবিষ্ণুসদৃশ। পুরুষার্থ সাধনের মাধ্যমেই বিষ্ণুলাভের পদ্ধতি সমগ্র দেশে সমান। সমগ্র ত্যাগী সন্ন্যাসী, মহাপুরুষ, গুরু, বীর যোদ্ধা ও স্বাধীনতা সংগ্রামী বিভিন্ন প্রান্ত, জাত ও ভাষাভাষী হলেও সমগ্র ভারতবাসীর কাছে তাঁরা শ্রদ্ধার ও মান্যতার পাত্র। সমাজের বিভিন্ন প্রদেশের মানুষের নামের গোত্র ও প্রবরের মধ্যে রয়েছে সাম্য। বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থাদির ঘটনাবলী যে কোনো ভাষায় চিত্র প্রদর্শিত হলেও সমগ্র দেশবাসী সেই সমস্ত ঘটনা বুঝতে সক্ষম হয়। কারণ ভাষার পার্থক্য থাকলেও সমগ্র মানুষের ভাবগত সাদৃশ্য রয়েছে। দেব-দেবীর মন্ত্র, সংস্কারাদির মন্ত্র ও প্রক্রিয়া সমগ্র দেশে সমান। গীতা, গঙ্গা, গায়ত্রী, গো ও মাতৃজাতির প্রতি সমগ্র দেশে রয়েছে সমান ভক্তি ও শ্রদ্ধা। জ্যেষ্ঠ, প্রবীণ ব্যক্তি ও পরিবেশের প্রতি সজাগতা ও সম্মানবোধ সবত্র সমানরূপে লক্ষণীয়। গৃহাদি সজ্জা, বাস্তুতন্ত্রের প্রয়োগে সমগ্র সমাজব্যাপী সমান ধারণা বিদ্যমান। মঠ-মন্দির, তীর্থক্ষেত্র, আশ্রমের প্রতি সমান কর্তব্যবোধ সমগ্র দেশে লক্ষণীয়ভাবে সাম্য রয়েছে। সমগ্র সমাজে রয়েছে সমান পাপ-পুণ্যের বোধ।

বর্তমানেও হিন্দু সমাজ অজ্ঞাতসারে এহেন আচরণ, ব্যবহার ও জীবনপদ্ধতিকে অনুসরণ করে চলেছে। ১৯৪১ সালে মনোবৈজ্ঞানিক Erich Fromm তাঁর Escape from Freedom গ্রন্থে লিখেছেন, প্রত্যেক জনগোষ্ঠী অন্ধভাবেই আবহমান কাল থেকে প্রচলিত ও প্রবাহিত জীবন পদ্ধতিকে অনুসরণ করে। ফ্রয়েড যাকে Instinct বলেছেন,

ক্রম তাকে culture বলেছেন। তাঁর মতে Social Character -এর মধ্যেই National Character সমাবিষ্ট রয়েছে। ভারতের সামাজিক চরিত্রের শুদ্ধতা নির্মিত হয়েছে সংস্কারের মাধ্যমে যা বর্তমানেও সমানভাবে অব্যাহত এবং যার ফলে সামাজিক ঐক্য ও সমাজে নিহিত রয়েছে যা সমান সমাজের পরিচারক।

সাংস্কৃতিক ঐক্য—ভারতীয় সংস্কৃতির বিকাশের মূলধারা হলো 'ধর্ম' বা মূল্যবোধ, যা রিলিজিয়ন নয়। রিলিজিয়ন বা মত-পথ পৃথিবীতে বহুবিধ রয়েছে যেগুলির অনুগামীরা অন্য মত-পথকে অব্যবহারিক ও তুচ্ছ হিসেবে প্রমাণ করতে সদা তৎপর। ফলে মানব সমাজে সংঘাত সৃষ্টি হয়েছে। সমাজ-সম্প্রদায়ভেদে হিন্দুদেরও কিছু মত-পথ রয়েছে, কিন্তু হিন্দু নামে কোনো ধর্মমত নেই। ভারতের ধর্ম হলো— সনাতন। হিন্দুরা এই 'ধর্ম' পালন করে থাকে। এ কারণে স্বামী বিবেকানন্দ সনাতন ধর্মকে 'হিন্দুধর্ম' আখ্যা দিয়েছেন। 'হিন্দু' প্রকৃতপক্ষে হলো একটি জাতিবাচক শব্দ। আর হিন্দুত্ব হলো ভারতের জীবনধারা। উপাসনা পদ্ধতি প্রতিটি মত-পথের অনিবার্য অঙ্গ কিন্তু তার সঙ্গেই 'ধর্ম' সৃষ্টিকালে তার জন্মস্থানে বিদ্যমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ জীবনের লক্ষ্যে যথোচিত সামাজিক নিয়ম ও তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করাই ধর্মপ্রবর্তকদের কাছে ছিল অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। ফলে পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই এই নিয়মাবলীর পরিবর্তন হতে থাকে। সেই কারণে সামাজিক তত্ত্বজ্ঞান সর্বকালীন, চিরস্থায়ী ও সর্বগ্রাহ্য হয় না। যদিও উপাসনা পদ্ধতি সর্বকালীন হতে পারে। সুতরাং জাতিগঠনে এই উপাসনাপদ্ধতি তেমন কিছু প্রভাবী উপাদান নয়।

ভাষা, ধর্ম, শাসনপদ্ধতি প্রভৃতির চেয়ে জাতি গঠনের শক্তিশালী উপাদান হলো সংস্কৃতি। সেই জন্য সংস্কৃতি যা স্থায়ী ও সর্বকালীন সত্য। সেই কারণে সংস্কৃতিকে জাতির আত্মা বলা হয়েছে। পৃথিবীর মানচিত্রে গ্রিস, রোম, মিশর প্রভৃতি দেশের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকলেও সে সমস্ত দেশের সংস্কৃতির বিনষ্টির কারণে সেগুলিকে মৃতদেশ রূপে আখ্যায়িত করা হয়। ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশের মানুষ উপাসনা পদ্ধতি পরিবর্তন করলেও ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তিতেই তারা তাদের জাতীয়তাকে বজায় রেখেছে। অন্যদিকে বহু দেশের মানুষের উপাসনা পদ্ধতির মধ্যে সাম্য থাকলেও সাংস্কৃতিক বিভিন্নতার জন্য তারা এক জাতিতে পরিণত হতে পারেনি। ভাষার ক্ষেত্রে বা শাসনতন্ত্রের ক্ষেত্রেও এই একই কথা বলা যায়।

সংস্কৃতি সর্বদা একমুখী বা একসঞ্জী, কখনই তা মিশ্রিত হয় না। কারণ শুদ্ধতাই হলো সংস্কৃতির প্রকৃতি যা কখনই সংকর নয়। কিন্তু একথা সত্য যে পৃথিবীর সমস্ত দেশের মানুষই পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ। ফলে এক জাতির আচার-আচরণের প্রভাব অন্য জাতির উপর সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক।

একে সাংস্কৃতিক সমাগম বা cultural intercourse বলা হয়। কিন্তু এই সমাগমের ফলে অন্যের প্রভাবকে মূল সংস্কৃতি তার প্রকৃতিতে আত্মসাৎ করে একমুখী ভাবযুক্ত সংস্কৃতি গঙ্গার ন্যায় সমানভাবে প্রবাহিত হতে থাকে। যেমন বিবাহসূত্রে ভিন্ন আচার-ব্যবহারযুক্ত কন্যা অন্য আচারযুক্ত পরিবারের বধূ হিসেবে প্রবেশ করলে সে তার পূর্বের আচার পদ্ধতি ভুলে গিয়ে স্বামীগৃহের আচার-পদ্ধতি আত্মসাৎ করে নেয় এবং বধূর জীবনাচারণে আর কোনো পার্থক্য না থেকে সে শ্বশুরবাড়ির সদস্যে পরিণত হয়।

এই কারণে হাজার হাজার বছর ধরে একই জীবনপদ্ধতি, জীবনমূল্য, আচার ব্যবহার, শ্রদ্ধার কেন্দ্রবিন্দু, মান্যতা, চারিত্রিক শুদ্ধতা, পরিবার ব্যবস্থা প্রভৃতি যা জাতীয় পরিচিতি সেগুলি বহু বিদেশি আক্রমণের পরও ভারতে জীবন্ত রয়েছে এবং বর্তমানে এই সংস্কৃতিকে বিশ্বমানব হিন্দু সংস্কৃতি নামেই পরিচিতি দান করছে।

প্রকৃতিজাত প্রাণী প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে জীবনকার্য পরিচালনা করলেও মনুষ্য তার ব্যতিক্রম। কারণ মানুষ ইন্দ্রিয় পরিচালিত হয়েও মানবেতর প্রাণীর প্রকৃতিকে জয় করে সকলের সুখ-দুঃখের অংশীদার হয়ে সামাজিক প্রাণীতে পরিণত হয়েছে। ফলে মানুষের স্বরূপ হচ্ছে ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয়ই। মানুষই কেবল দেবত্ব লাভ করতে সক্ষম। কারণ দেবগুণ অর্জনের জন্য সংস্কারের পদ্ধতি মানুষ গ্রহণ করেছে যার পরিণতি হলো সংস্কৃতি। মানুষ ভদ্র ও সুরক্ষিত হওয়ার জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ, সংঘর্ষরহিত পরম্পরা সৃষ্টি করেছে যা পুষ্ট করার জন্য সত্য, দান, দয়া, ত্যাগ, ক্ষমা, সেবা প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলী মানব অন্তরে সৃষ্টি করার জন্য শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষগণ সতত তৎপর হয়ে চরিত্রবান ভারত নির্মাণ করে এই দেশকে বিশ্বগুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মেগাস্থিনিস, হিউ-এন-সাং থেকে বর্তমানে টয়েনবি, উইল ডুরান্ট পর্যন্ত বিদেশি মনীষীগণ ভারতীয় সংস্কৃতির গুণগান করেছেন।

ভারতীয় সংস্কৃতির মূলাধার হলো সমন্বয়, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য সাধন এবং সংঘর্ষহীনতা। Struggle for existence নয়, কারণ একমাত্র ভারতের মনীষীগণই সৃষ্টির মধ্যে চৈতন্যকে অনুভব করেছেন—সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। তাই প্রত্যেকের কল্যাণ কামনা করেছে ভারতবাসী—সর্বে বৈ সুখিনঃ সন্তু, প্রত্যেকের সমানাধিকার-সহ বাঁচার অধিকারের জন্য নির্মিত হয়েছে সমাজ ব্যবস্থা। সুতরাং Survival of the fittest নয়, বরং বাঁচার জন্য পারস্পরিক সহযোগিতা ও অনুকূলতা সৃষ্টির সংস্কার ভারতের সংস্কৃতি দান করেছে। মনুষ্য চরিত্রের বৈচিত্র্যানুসারে বিচিত্র কর্তব্য সাধনের মাধ্যমে সমাজের কল্যাণের লক্ষ্যে কর্তব্যধর্মের প্রবর্তন হয়েছে ভারতে, যে কারণে এখানে নেই Individual right। কেবল Individual duty -ই প্রধান লক্ষ্য। সংস্কারলব্ধ যে সমস্ত চারিত্রিক গুণাবলী, ভাব-ভাবনা, বাণী, কৃতি প্রভৃতি ভারতকে করেছে গৌরবান্বিত সেগুলি আজও একইভাবে বিভিন্ন বর্গের বিভিন্ন মতাবলম্বী ব্যক্তিদের কাছে অনুকরণীয়, যার প্রমাণ সমাজে বহুল পরিমাণে রয়েছে।

ভারতের সেকুলার নেতৃত্ব স্বাধীন দেশের আদর্শবচন হিসেবে 'যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ', 'সত্যমেব জয়তে' বা 'ধর্মচক্র প্রবর্তনায়' প্রভৃতি বাক্যগুলিকেই গ্রহণ করেছে। পুরনো লোকসভা গৃহের স্তম্ভে খোদিত হয়েছে মানব বাণী। Atheist (নাস্তিক) জওহরলাল নেহরু তাঁর পরলোকগতা স্ত্রী কমলা নেহেরুর দাহান্তে চিতাভস্ম গঙ্গার জলে বিসর্জন দিয়ে চরম তৃপ্তি লাভ করেছিলেন। কমিউনিস্ট নেতা নাম্বুদ্রিপাদ চীনের রাষ্ট্রপ্রধান মাও-সে-তুং-কে নটরাজ মূর্তি উপহার দেন। ভারতের সমস্ত অনুষ্ঠানেই উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন হয় প্রদীপ জ্বালিয়ে বা নারকোল ফাটিয়ে। গৃহনির্মাণের সময় ভিত্তি পূজা, গৃহপ্রবেশে হোম-যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান সর্বত্র প্রচলিত রয়েছে। প্রাক্তন সাংসদ ডাঃ বসিউদ্দিন বলেছেন, কায়রোতে তাঁকে সকলেই হিন্দু-মুসলমান হিসেবেই সম্বোধন করতো। এই সমস্ত বহু উদাহরণ ভারতের সাংস্কৃতিক ঐক্য ও তার অব্যাহত গতির পরিচায়ক। □

নারীশক্তির জাগরণেই সমাজের অভ্যুদয় ত্বরান্বিত হয়

নারী যদি সমাজের অর্ধেক অংশ হয়, তবে এই অংশের পূর্ণ জাগরণ ছাড়া জাতীয় উন্নয়ন কখনোই সম্পূর্ণ হতে পারে না।

কেয়া ঘোষ

একবিংশ শতাব্দীর প্রথম আড়াই দশক অতিক্রান্ত। নির্দ্বিধায় বলা যায় এই শতাব্দী হচ্ছে নারীশক্তির জাগরণ ও অগ্রগতির শতাব্দী। আর আমরা তো হচ্ছি সেই সভ্যতা, যার অন্যতম মূল মন্ত্রই হচ্ছে, 'যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ। যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্বাস্তাত্রফলাঃ ক্রিয়াঃ।' অর্থাৎ যেখানে নারীদের সম্মান বা পূজা করা হয়, সেখানে দেবতারা বাস করেন বা প্রসন্ন থাকেন। নারীশক্তির জাগরণ কেবল নারীজাতির সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়, নারী শক্তি হচ্ছে সমাজ ও সভ্যতার চালিকাশক্তি কাজেই নারীর জাগরণের সঙ্গে সমাজ ও সভ্যতার উত্থান ও অগ্রগতি গভীরভাবে জড়িত।

নারীশক্তির জাগরণ বলতে নারীর সুপ্ত ক্ষমতা, প্রতিভা ও অধিকারের সামগ্রিক স্ফুরণকে বোঝায়। এটি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং যুগ যুগ ধরে চাপা পড়ে থাকা এক বিশাল সম্ভাবনার মুক্তি। যখন নারী তার মেধা ও কর্মদক্ষতাকে সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতির মূল স্রোতে প্রবাহিত করার সুযোগ পায়, তখনই সেই 'জাগরণ' সম্পূর্ণ হয়। পরিস্থিতির কারণে দীর্ঘকাল ধরে নারী গৃহকোণে আবদ্ধ ছিল। একবিংশ শতকে এসে এই চিত্রটি দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। নারী আজ শুধু পরিবার বা গৃহস্থালীর দায়িত্বেই সীমাবদ্ধ নয়; সে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, সাহিত্য, খেলাধুলা এবং রাজনীতির মতো প্রতিটি ক্ষেত্রেই নিজের যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখছে। এই প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য হলো— নারী শক্তির জাগরণ কেবল নারীর ব্যক্তিগত মুক্তি নয়, বরং একটি জাতি ও বিশ্ব সভ্যতার পূর্ণাঙ্গ বিকাশের জন্য অপরিহার্য শর্ত।

প্রাচীন ভারতীয় ও বাঙ্গালি সমাজ নারীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিল, যার প্রমাণ মেলে দেবী রূপে নারীর পূজা এবং বৈদিক যুগে গার্গী বা মৈত্রেয়ীর মতো বিদুষী নারীদের উপস্থিতি থেকে। তবে, মধ্যযুগের ইসলামি শাসনকালে অন্ধকার এবং পরবর্তীকালে ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাবে সমাজ ক্রমশ রক্ষণশীল হয়ে ওঠে। সতীদাহ প্রথা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও পর্দাপ্রথার মতো নানা সামাজিক কুপ্রথা নারীকে অন্তঃপুরের চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ করে ফেলে। নারীর পরিচিতি হয়ে ওঠে কেবল 'কন্যা, জায়া ও জননী'— এর বাইরে তার নিজস্ব কোনো সত্তা ছিল না।

উনবিংশ শতকে বঙ্গের যে নবজাগরণ সূচিত হয়, তা নারী মুক্তির প্রথম আনুষ্ঠানিক বীজ বপন করে। রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো সমাজ সংস্কারকরা নারীর মৌলিক মানবিক অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য লড়াই শুরু করেন। বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে বিধবা বিবাহ আইন পাশ হওয়া এবং শিক্ষাবিস্তারে নারীর সামাজিক মর্যাদা পুনরুদ্ধারে এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ ছিল। এই সময় থেকেই শুরু হয় নারীর জন্য শিক্ষার দ্বার উন্মোচন। বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠা এবং পরবর্তীকালে অন্যান্য নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মাধ্যমে নারী জাগরণের প্রথম ধাপ সম্পন্ন হয়।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম কেবল রাজনৈতিক মুক্তিলাভের আন্দোলন ছিল না, বরং এটি ছিল এক যুগান্তকারী সামাজিক বিপ্লব— যার মূলে ছিল নারীসমাজের আত্মানুসন্ধান ও রাজনৈতিক সক্রিয়তা। ঔপনিবেশিক শাসনের শৃঙ্খলমুক্তির এই মহাযজ্ঞে নারীর অংশগ্রহণ কোনো আকস্মিক ঘটনা ছিল না, বরং তা ছিল শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলে আসা সামাজিক গোঁড়ামি, এবং ঔপনিবেশিক শোষণ— এই দ্বিবিধ বন্ধন ছিন্ন করার এক সুচিন্তিত পদক্ষেপ। ব্রাহ্মসমাজ, আর্যসমাজ ও রামকৃষ্ণ মিশনের মতো ধর্মীয়-সামাজিক সংগঠনগুলি নারীদের জন্য নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্র তৈরি করেছিল, যেখানে তারা সাংগঠনিক দক্ষতা ও জনসেবার ধারণা লাভ করে। এই সময় থেকেই সবলা হওয়ার প্রথম পরিবর্তনটি সূচিত হয়। সমাজ বুঝতে পারে যে জাতির অগ্রগতিতে সকলের মুক্তি অপরিহার্য। এই প্রাথমিক সংস্কার আন্দোলনই নারীকে স্বদেশের প্রতি দায়িত্বশীল করে তোলে এবং স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণের মানসিক প্রস্তুতি জোগায়।

স্বাধীনতা আন্দোলনে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রথম সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয় বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী (১৯০৫) এবং স্বদেশী আন্দোলনের সময়কালে। এই আন্দোলনের রাজনৈতিক চরিত্র নারীর অংশগ্রহণের ধরন পালটে দেয়। আগে তারা ছিল সমাজ সংস্কারের গ্রহীতা, এখন তারা হয়ে উঠল সক্রিয় দেশপ্রেমিক। স্বদেশী আন্দোলনে নারীরা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তারা কেবল বিদেশি পণ্য বর্জন করে নিজেদের বাড়িতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং মিছিলে অংশ নেয়, বিদেশি পণ্যের দোকানে পিকেটিং করে এবং নিজেদের বাড়িতে চরকা ও তাঁতের মাধ্যমে স্বদেশী দ্রব্য উৎপাদনে ব্রতী হয়। সরলা দেবী চৌধুরানী এই সময়ে 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রতিষ্ঠা করেন, যার উদ্দেশ্য ছিল স্বদেশী শিল্প ও পণ্যের প্রচার ও প্রসারে অর্থ সরবরাহ করা। ভগিনী নিবেদিতার মতো বিদেশি বংশোদ্ভূত মহীয়সী নারীও ভারতের জাতীয়তাবাদী আদর্শে দীক্ষিত হয়ে এই সংগ্রামে যুক্ত হন। এই সময়ে বহু নারী দেশাত্মবোধক গান রচনা করেন এবং সেগুলি জনসমক্ষে পরিবেশন করে জনসাধারণের মধ্যে স্বদেশপ্রেমের উদ্দীপনা সঞ্চারিত করেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে, হোমরুল আন্দোলন (১৯১৬-১৯১৮) অ্যানি বেসান্তের নেতৃত্বে নারী নেতৃত্বকে প্রথম সারিতে নিয়ে আসে। বেসান্তের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও সাংগঠনিক দক্ষতা ভারতীয় মহিলাদের রাজনৈতিক মঞ্চে নিজেদের দাবি উত্থাপনের সাহস জোগায়। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'উইমেনস্ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' ছিল ভারতীয় মহিলাদের প্রথম জাতীয় স্তরের রাজনৈতিক মঞ্চগুলির মধ্যে অন্যতম। এই পর্বেই নারীর জাতীয়তাবাদী চেতনা ব্যক্তিগত দেশপ্রেম থেকে সংগঠিত রাজনৈতিক দাবিতে রূপান্তরিত হতে শুরু করে। আইন অমান্য ও (১৯২০- ১৯৩৪) অসহযোগ আন্দোলনে নারীরা বৃহৎ সংখ্যায় যোগ দেন। তারা বিদেশি বস্ত্র বর্জন করে খাদি পরিধান করেন এবং মাদকদ্রব্যের দোকানে পিকেটিং শুরু করেন। তবে, নারীদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সবচেয়ে উজ্জ্বল

দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয় ১৯৩০ সালের লবণ সত্যাগ্রহে।

প্রসঙ্গথ উল্লেখ্য, গান্ধীজী প্রথমে নারীদের ডাণ্ডি অভিযানে অংশগ্রহণের অনুমতি না দিলেও, পরে সরোজিনী নাইডুর নেতৃত্বে বহু নারী এই আন্দোলনে যুক্ত হন। তাঁরা আইন অমান্য করে প্রকাশ্যে লবণ তৈরি করেন, পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন এবং কারাবরণ করেন। এই আন্দোলনে সরোজিনী নাইডু, কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়, হংস মেহতা এবং পূর্ববঙ্গের লীলা নাগ (রায়)-এর মতো নেত্রীরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। এটি ছিল এক বিশাল পদক্ষেপ, যা সমাজের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে রাজনৈতিক ময়দানে নারীর স্থান পুরুষের ঠিক পাশেই। আইন অমান্য আন্দোলনে নারীরা কেবল সংগঠক হিসেবেই নয়, বরং 'ডিক্টেটর' হিসেবেও কাজ করেন, যখন প্রথম সারির পুরুষ নেতারা গ্রেপ্তার হন। বোম্বাইয়ে অবন্তিকাবাই গোখলে, বঙ্গপ্রদেশে লতিকা ঘোষ এবং উত্তরপ্রদেশে বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের নেতৃত্বে নারীরা আন্দোলনকে গতিশীল রাখেন। ভারত ছাড়ো আন্দোলন ও আঞ্চলিক নেতৃত্ব (১৯৪২) ১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়ো' বা 'আগস্ট বিপ্লব' ছিল জাতীয়তাবাদী নারীশক্তি জাগরণের চূড়ান্ত রূপ। গান্ধীজী 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' (ডু অর ডাই)-এর ডাক দিলে নারীরা সর্বস্তরে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। অরুণা আসফ আলি আত্মগোপন করে আন্দোলন পরিচালনা করেন এবং তাঁকে জনমানসে 'আগস্ট বিপ্লবের দেবী' উপাধি দেওয়া হয়। এই সময়ে আঞ্চলিক স্তরে অসংখ্য অসামান্য নারী নেতৃত্বের উত্থান ঘটে।

বঙ্গপ্রদেশে ৭৩ বছর বয়সি মাতঙ্গিনী হাজরা তমলুকে ব্রিটিশ পুলিশের গুলিতে প্রাণ দেন— যা নারীশক্তির সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের উদাহরণ। অসমে কনকলতা বড়ুয়া, মহারাষ্ট্রে ননীবালা দেবী এবং ওড়িশায় রমা দেবী ও মালতী চৌধুরীর মতো নারীরা স্থানীয় আন্দোলনে বার্তা পৌঁছে দেন। বিপ্লবী ধারা ও সশস্ত্র সংগ্রাম, জাতীয়তাবাদী নারীশক্তির জাগরণ কেবল অহিংস পথেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বঙ্গে অগ্নিযুগে বহু নারী সশস্ত্র বিপ্লবের পথে হেঁটেছেন। প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ও কল্পনা দত্ত ছিলেন এর মধ্যে অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার পাহাড়তলী ইউরোপীয় ক্লাব অভিযানের নেতৃত্ব দেন এবং আত্মাহুতি দেন। কল্পনা দত্ত বিপ্লবী সূর্য সেনের দলে যোগ দিয়ে সশস্ত্র সংগ্রামে অংশ নেন এবং পরে কারাবরণ করেন। এই নারীরা প্রমাণ করেন যে দেশের মুক্তি কামনায় তারা পুরুষদের মতোই নির্ভীক এবং আত্মোৎসর্গে প্রস্তুত। বিপ্লবী চেতনায় বিশ্বাসী নারী সংগঠন, যেমন বিপ্লবী, দেশপ্রেমী লীলা নাগের 'দীপালী সঙ্ঘ', নারীদের আত্মরক্ষা ও রাজনৈতিক শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উত্তরাধিকার ও জাতীয় জীবনে প্রভাব জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে নারীশক্তির জাগরণ কেবল স্বাধীনতার পথ সুগম করেনি, বরং স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। সরোজিনী নাইডু, হংস মেহতা, বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত এবং দুর্গাবাঈ দেশমুখের মতো মহীয়সীরা গণপরিষদের সদস্য হিসেবে সংবিধান প্রণয়নে সরাসরি অংশ নেন এবং নারী-পুরুষের সমতার ধারণাটিকে সাংবিধানিক ভিত্তি দেন।

নারী শক্তির জাগরণের সর্বশ্রেষ্ঠ ও অপরিহার্য মাধ্যম হলো শিক্ষা। শিক্ষা নারীকে আত্মসচেতন, আত্মবিশ্বাসী ও আত্মনির্ভরশীল করে তোলে। শিক্ষার মাধ্যমেই নারী তার অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে অবগত হতে পারে এবং সমাজের প্রতিষ্ঠিত ভুল ধারণাগুলিকে চ্যালেঞ্জ জানাতে সক্ষম হয়। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, বর্তমানে ভারত সরকার 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও'-এর মাধ্যমে গোটা দেশজুড়ে কন্যা সন্তানের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যে সচেতনতা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে তার পরিণামস্বরূপ গত এক দশকে দেশের সরকারি বিদ্যালয়গুলিতে কন্যাসন্তানের ভর্তির হার বিগত দশকের তুলনায় ১১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মাধ্যমিক-দশম শ্রেণী উত্তীর্ণ ছাত্রীদের সংখ্যায় ঐতিহাসিক ১৮.৪ শতাংশ বৃদ্ধি এবং স্নাতক উত্তীর্ণ ছাত্রীদের ঐতিহাসিক ২৩ শতাংশ বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়েছে।

অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা হলো নারী জাগরণের একটি অত্যন্ত শক্তিশালী স্তম্ভ। যখন একজন নারী উপার্জন করেন, তখন কেবল তার ব্যক্তিগত সচ্ছলতা বাড়ে না, বরং পরিবার ও সমাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তার গুরুত্ব বাড়ে। গত দশকে কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ দ্রুতগতিতে বেড়েছে। ক্ষুদ্র শিল্প থেকে শুরু করে আইটি সেক্টর পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রেই নারীর শ্রম ও মেধা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

ক্ষুদ্র ঋণ (Microfinance) এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীর (Self-Help Groups) মাধ্যমে গ্রামীণ নারীরাও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হয়েছে। জন ধন যোজনা, মুদ্রা লোন, ড্রোন দিদি, লাখপতি দিদি, বিশ্বকর্মা প্রকল্প, জীবিকা দিদি ইত্যাদি প্রকল্পের মাধ্যমে অর্থনৈতিক মুক্তি তাদের পারিবারিক নিপীড়ন থেকে রক্ষা করছে এবং খাদ্য, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় করার মাধ্যমে পরিবারের সামগ্রিক জীবনযাত্রার মান উন্নত করছে। গ্রামীণ অর্থনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে এবং দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। একজন স্বনির্ভর নারী ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় আজ সম্পদ ও উৎপাদনশীলতার প্রতীক। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের সূত্রে জানা গেছে, ২০১০-১১ সালে মহিলা মালিকানাধীন সংস্থার হার ১৭.৪ শতাংশ ছিল, যা ২০২৩-২৪ সালে বেড়ে ১.৯২ কোটি হয়েছে। এই পরিসংখ্যানগুলি অর্থনীতিতে নারীর ক্রমবর্ধমান নেতৃত্ব এবং 'বিকশিত ভারতের' পথে তাদের সক্রয়তার ভূমিকা প্রমাণ করে। ২০১৭-১৮ থেকে ২০২৩-২৪ সালের মধ্যে মহিলাদের শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণ (LFP) ২২ শতাংশ থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে ৪০.৩ শতাংশ হয়েছে এবং বেকারত্বের হার কমেছে। এই সময়ের মধ্যে 'লক্ষপতি দিদি'-দের সংখ্যা ২ কোটিতে পৌঁছেছে এবং মোট মুদ্রা ঋণের ৬৮ শতাংশ মহিলারা পেয়েছেন। গুরুত্বপূর্ণ নতুন তথ্য হলো, গত দশকে জেন্ডার বাজেটের বরাদ্দ ৪২৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং নীতিগত দৃষ্টিভঙ্গিতে 'উন্নয়নের জন্য নারী' থেকে 'নারী-নেতৃত্বাধীন উন্নয়ন'-এ একটি সুস্পষ্ট পরিবর্তন এসেছে।

নারী শক্তির জাগরণকে স্থায়িত্ব দিতে প্রয়োজন রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্তরে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ। ভারতে পঞ্চায়েত স্তরে এবং স্থানীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থায় নারীর জন্য আসন সংরক্ষণ নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের এক বৈপ্লবিক পদক্ষেপ। এই সংরক্ষণের ফলে প্রান্তিক স্তরে হাজার হাজার নারী নেত্রী হিসেবে উঠে এসেছেন, যারা সরাসরি জনগণের সমস্যা সমাধানে নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

জাতীয় রাজনীতিতেও নারীর উপস্থিতি বাড়ছে। আজ দেশের রাষ্ট্রপতি, অর্থমন্ত্রী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী, শিল্পমন্ত্রী, দেশের রাজধানী শহরের মুখ্যমন্ত্রীর মতো উচ্চ পদগুলিতে নারীরা তাদের নেতৃত্ব ও প্রশাসনিক দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছেন। এই অংশগ্রহণ কেবল একটি প্রতীকী বিষয়

নারী জাগরণের অর্থ শুধু চাকরি বা পদ লাভ নয়, বরং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্তরে নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন।

নয়, বরং এটি প্রমাণ করে যে সুযোগ পেলে নারীরা যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সফলভাবে পালন করতে সক্ষম। নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে নারী ও শিশুদের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতে সাহায্য করে, যা একটি সমতাভিত্তিক সমাজ গঠনে সহায়ক। একটি সমাজ যখন নারীর সমানাধিকারকে সম্মান দিয়ে এবং মেধার ওপর ভরসা করে, তাঁকে সামনের সারিতে নেতৃত্ব দানের সুযোগ করে দেয়, তার সুফল পায় সমগ্র দেশ ও জাতি। আজ দেশের অর্থ মন্ত্রকের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলাচ্ছেন একজন মহিলা এবং কোভিড পরবর্তী সময়কালে মুদ্রাস্ফীতি যেমন নিয়ন্ত্রিত ও কম, অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে ভারত জিডিপি বৃদ্ধির নিরিখে এগিয়ে চলেছে। নারী শক্তি অগ্রগতির এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন হচ্ছে আজ ভারত সরকারে নারীর প্রতিনিধিত্ব যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে ঠিক তেমনই আন্তর্জাতিক একাধিক মঞ্চে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করছে এমন কূটনৈতিক স্তরে মহিলা কূটনীতিকদের সংখ্যাতেও উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি দেখা দিয়েছে।

নারী শক্তির জাগরণের প্রকৃষ্ট উদাহরণ আমরা দেখতে পেলাম এই বছরেই যখন পাকিস্তানি ইসলামি জঙ্গিরা পহেলগাঁওয়ে নারকীয় সন্ত্রাসী আক্রমণ চালিয়ে ২৬ জন নিরীহ ভারতীয় হিন্দু পর্যটককে তাদের ধর্ম জিজ্ঞাসা করে হত্যা করল, তার পালটা 'অপারেশন সিঁদুর' চালিয়ে ভারতীয় সেনা পাকিস্তানি জঙ্গি ও সৈন্য ঘাঁটি ধ্বংস করল এবং তার আনুষ্ঠানিক প্রেস কনফারেন্স করে গোটা পৃথিবীকে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের কঠোর ও আপোশহীন অবস্থান সম্পর্কে অবগত করলেন ২ জন নারী— সোফিয়া কুরেশি এবং ব্যোমিকা সিংহ।

নারী জাগরণের অর্থ শুধু চাকরি বা পদ লাভ নয়, বরং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্তরে নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। সাহিত্য, শিল্পকলা এবং গণমাধ্যম এই জাগরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। নারীরা এখন শুধু অনুপ্রেরণার উৎস বা লাবণ্যময়ী চরিত্র নয়; তারা এখন শক্তিশালী, বুদ্ধিমান এবং জটিল চরিত্রে নিজেদের তুলে ধরছেন, যা সমাজে নারীর প্রচলিত ধারণাকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে।

নারীরা আজ গার্হস্থ্য হিংসা, পণপ্রথা এবং লিঙ্গ বৈষম্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার। দেশে নারীবিরোধী বিভিন্ন কুরীতি ও প্রথার বিরুদ্ধে কঠোর আইন তৈরি হয়েছে। তিন তালাক বিল (২০১৯) যেমন ধর্মীয়-সামাজিক গোঁড়ামিকে নষ্ট করে নারীর সমানাধিকার সুনিশ্চিত করেছে, তেমনই নারীশক্তি বন্দন অধিনিয়ম (২০২৩) রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়ন, সমানাধিকার এবং অংশগ্রহণমূলক প্রতিনিধিত্বকে সুনিশ্চিত করেছে। নারীর প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি এখন অনেকটাই পরিবর্তিত। কন্যা সন্তানকে এখন আর বোঝা মনে করা হয় না, বরং তাকে ভবিষ্যতের সম্পদ হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। এই সাংস্কৃতিক পরিবর্তনই নারী জাগরণের দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব নিশ্চিত করে। সামাজিক প্ল্যাটফর্ম এবং ডিজিটাল মাধ্যমে নারীরা তাদের মতামত প্রকাশ করে, যা তাদের সম্মিলিত কণ্ঠস্বরকে আরও শক্তিশালী করেছে। ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় নারীরা বর্তমানে সমাজ ও দেশ পরিচালনায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

নারীশক্তির জাগরণ হওয়া সত্ত্বেও এখনও অসংখ্য চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। এর মধ্যে প্রধান হলো— লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা, কর্মক্ষেত্রে মজুরি বৈষম্য এবং নিরাপত্তাহীনতা। নারীর অগ্রগতিকে মেনে নিতে সমাজের অভ্যন্তরে এক ধরনের প্রতিরোধ দেখা যায়, যা বিভিন্ন সময় শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। দুর্ভাগ্যজনক কিছু সামাজিক 'ফতোয়া' আজ নারীশক্তির সামগ্রিক জাগরণের ক্ষেত্রে বড়ো প্রশ্ন চিহ্ন তুলে দেয় আমাদের দেশে, বিশেষত যখন আমরা দেখি প্রশাসনের সর্বোচ্চ আসনে বসে একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রী ধর্ষিতা একজন নাবালিকার চরিত্রহননে অবতীর্ণ হয়ে অবিবেচকের মতো মন্তব্য করেন, 'মেয়েটার রেপ হয়েছে, নাকি প্রেগন্যান্ট ছিল, নাকি লাভ অ্যাফেয়ার ছিল তা দেখতে হবে'! আবার কখনো মধ্যযুগীয় 'ফতোয়া' শুনি, 'রাতে মেয়েদের বাড়ির বাইরে বেরোতে দেওয়া উচিত নয়'! এই ধরনের মন্তব্য আমাদের সমাজের জন্য যেমন ক্ষতিকারক তেমনই নারী শক্তির সামগ্রিক উত্থানের পথে বড়ো অন্তরায়। নারী নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে ব্যর্থ প্রশাসকরা এভাবে যুগে যুগে নারীদের 'অপরাধী' বানিয়ে নারীশক্তিকে দুর্বল করার কাজ করেছে।

নারীশক্তির জাগরণ একটি চলমান প্রক্রিয়া, যার চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো একটি ন্যায়সঙ্গত, সমতাপূর্ণ ও উন্নত সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। শিক্ষা, অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণ এই জাগরণের তিনটি অপরিহার্য ভিত্তি। ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, যখনই নারীর ক্ষমতাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, তখনই সমাজ দ্রুত উন্নতির পথে এগিয়েছে। আজকের নারী কেবল তার অধিকার দাবি করছে না, সে নিজের যোগ্যতা ও শ্রম দিয়ে তা অর্জন করছে। নারী যদি সমাজের অর্ধেক অংশ হয়, তবে এই অংশের পূর্ণ জাগরণ ছাড়া জাতীয় উন্নয়ন কখনোই সম্পূর্ণ হতে পারে না। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে এমন একটি বিশ্ব উপহার দিতে হবে, যেখানে লিঙ্গ পরিচয়ের ভিত্তিতে কোনো বৈষম্য থাকবে না, যেখানে প্রত্যেক নারী তার পূর্ণ সম্ভাবনা নিয়ে বিকশিত হতে পারবে। নারী শক্তির এই জাগরণ কেবল একটি আশা নয়, বরং একটি সভ্যতার অপরিহার্য চাহিদা। সমাজ ও সরকার উভয়েরই কর্তব্য হলো এই জাগরণকে সুরক্ষিত ও ত্বরান্বিত করা। □

ফ ঃ ৩

ভারত-বিরোধিতা, আক্রমণ, লাভজেহাদ, অনুপ্রবেশ—সবেতেই বামপন্থীরা গিরগিটি

অমিত দাশ

ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট আন্দোলনের পথিকৃৎ তথা মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সকলের কাকাবাবু মুজাফ্‌ফর আহমেদ বাংলা ভাষায় কমিউনিস্টদের প্রথম মুখপত্র 'লাঙল' পত্রিকার ১৯২৬-এর ২৮-এ জানুয়ারি সংখ্যায় লিখেছেন, 'মসজিদে মসজিদে মুসলমানরা নামাজ পড়ে থাকেন। সেই নামাজের নাকি ভয়ানক ব্যাঘাত ঘটে— হিন্দুরা তার সম্মুখ দিয়ে বাদ্য বাজিয়ে গেলে। বড় বড় শহরে ট্রামের ঘরঘরানিতে নামাজের ব্যাঘাত হয় না, মোটরের ভোঁ-ভোঁতেও কোনো ব্যাঘাত হয় না, এমনকী মোহরমের বাদ্য যত তুমুলভাবেই বাজুক না কেন তাতেও নামাজের এতটুকুও ব্যাঘাত প্রাপ্ত হয় না,— হয় কেবল হিন্দুর বাদ্যধ্বনিতে।'

অতীতকাল থেকে আজকের একবিংশ শতক পর্যন্ত ভারতবর্ষে যত মুসলমান আক্রমণ সংঘটিত হয়েছে, মুজাফ্‌ফর আহ্‌মেদ সাহেব তার কারণটি সঠিক চিহ্নিত করতে পারলেও একালের মার্কসবাদীরা দলের প্রতিষ্ঠাতার প্রবন্ধের সেই শিক্ষাগ্রহণ করা তো দূরের কথা, পৃষ্ঠা খুলতেও আতঙ্কিত হবেন শুধুমাত্র মুসলমান ভোটের কথা ভেবে।

মুসলমানদের একটি বড় অংশের (নিশ্চিতভাবেই এ.পি.জে. আবুল কালাম, নজরুল ইসলাম, রেজাউল করিম প্রমুখ ব্যতীত) আনুগত্য চিরকালই ভারতবর্ষের প্রতি নেই সে সত্যটিও তুলে ধরেছিলেন কমিউনিস্ট দলের আর একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য আবদুল হালিম। উল্লেখ্য, বাংলাভাষায় 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'র প্রথম প্রকাশক ছিলেন হালিম সাহেব।

দলের মুখপত্র 'গণবাণী' (লাঙল নাম পরিবর্তিত হয়ে) পত্রিকার ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের ৯ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় 'স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমান ও ভারতের আদর্শ' শীর্ষক প্রবন্ধে হালিম লিখেছেন— 'হিন্দুরা ভারতবর্ষের প্রাচীন অধিবাসী। মুসলমানদের মধ্যেও কেহ-বা প্রাচীন অধিবাসী, কেহ-বা স্থায়ী অধিবাসী। এদেশে বাস করে, এদেশে মানুষ হয়ে মুসলমানদের অন্তরে যদি এদেশের ওপর একটা মমতাবোধ না জন্মায়, তাহলে তার চেয়ে বেশি দুঃখ আর কী হতে পারে?'

হালিম সাহেবের অনুভব সম্পর্কে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

'লাভজেহাদ' কথাটি শুনলেই নানারঙের তোয়াজিরা হিন্দু-গন্ধ পেয়ে নাকে রুমাল চাপা দেন। শব্দটি যে নিছক কোনো হিন্দুবাদী বা সনাতনীর নয়, আগমার্কা মার্কসবাদী কেরালা রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর। দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ভিএস অচ্যুতানন্দনের, সেটি 'টুকরে টুকরে' দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ পশ্চিমবঙ্গের উঠতি কমরেডদের না জানা থাকলে তোয়াজিদলের দৈনিক মুখপত্র 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র ৯.৮.২০১০-এর সংস্করণটি দেখে নিতে পারেন। বিধানসভায় কেরালার প্রাক্তন মার্কসবাদী মুখ্যমন্ত্রী 'লাভ জেহাদ' পরিকল্পনা 'ফাঁস' করে দিয়েছিলেন। 'কেরালা ফাইলস্' তো এই সেদিনের।

মার্কসবাদীরা ক্ষমতায় থাকলে কীভাবে এদেশের মুসলমান জেহাদিদের ষড়যন্ত্র প্রকাশ করে দিতে বাধ্য হন, তার অজস্র উদাহরণ ছড়ানো রয়েছে বাম সমর্থিত তথাকথিত 'সেকুলার' পত্র-পত্রিকায়। মনে করা যেতে পারে পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের অভিজ্ঞতা।

২০০৫ খ্রিস্টাব্দের ১৭ নভেম্বর 'সেকুলার'দের প্রাণের সংবাদপত্র এক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল বুদ্ধদেববাবুর অভিজ্ঞতা। মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং জানিয়েছেন কীভাবে বাংলাদেশ থেকে ইসলামি জেহাদিরা পশ্চিমবঙ্গে অনুপ্রবেশ করে অশান্তি সৃষ্টি করছে অথবা অশান্তির ষড়যন্ত্র করছে। উল্লেখ্য, বুদ্ধদেববাবু এই মন্তব্য করেছেন সিআইডি-র শতবর্ষ পূর্তির অনুষ্ঠানে, প্রকাশ্য মঞ্চে। তিনি অনুপ্রবেশের জন্য কেন্দ্রের মনমোহন সিংহ সরকারের নরম মনোভাব বিষয়েও নিজের ক্ষোভ ব্যক্ত করেছিলেন।

২০০৩ সালেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশের সমস্যা নিয়ে জরুরি ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি করেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গোয়েন্দা বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল শ্যামল দত্ত দ্বারা প্রদত্ত রিপোর্টটি উল্লিখিত হয় ৭ নভেম্বর সংখ্যায়।

সীমান্তের মাদ্রাসাগুলি যে সন্ত্রাসবাদ ও ভারতবিরোধী কাজের আখড়া হয়ে উঠেছে, সে বিষয়ে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বার বার কেন্দ্রের মনমোহন সিংহ সরকারকে সাবধান হতে পরামর্শ দিয়েছেন।

২০০৩-এর ২৭ মার্চ আনন্দবাজার পত্রিকায় নদীয়া জেলার ধানতলার 'আইসমালি ইব্রাহিমিয়া দার-উল-উলম' মাদ্রাসায় দীর্ঘদিন ধরে সন্ত্রাসবাদী ও সাম্প্রদায়িক কাজকর্ম সংঘটিত হচ্ছে বলে সাংবাদিকদের জানায় বামফ্রন্ট সরকার।

২০০২-এর ৫ এপ্রিলের সংবাদপত্রে পশ্চিমবঙ্গের বাম সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগ থেকে প্রাপ্ত অনুপ্রবেশ ও মাদ্রাসায় দেশবিরোধী কাজকর্মের সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

সীমান্তের মাদ্রাসা ও মসজিদগুলি যে ক্রমশ দেশবিরোধী ইসলামি জেহাদিদের নিয়ন্ত্রণে চলে যাচ্ছে প্রকাশ্যে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তা জানানোর পর দল তাঁকে সেন্সর করেছিল সে তো সকলের জানা।

কেন্দ্রে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থাকাকালীন সিপিআই নেতা ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত স্বয়ং লোকসভায় জানিয়েছিলেন যে ভারতে তখনই অন্তত ২ কোটি অনুপ্রবেশকারী রয়েছে। লক্ষণীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রাথমিক পর্যায়ের এমনকী মুসলমান নেতারাও যে সত্য স্বীকার করতে পারছেন, এখনকার ভুঁইফোঁড় ছোটো-বড়ো-মাঝারি নাম নেতারা তা বিজেপি-আরএসএসের চক্রান্ত বলে উড়িয়ে দিলেও ইতিহাস কিন্তু মিথ্যে হয়ে যাবে না।

প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, ক্ষমতায় অর্থাৎ সরকারে থাকলে কিছু পরিমাণে দায়িত্ববোধ থেকে বাম মুখ্যমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীরা যে সত্য চাপা দিতে পারেননি, ক্ষমতা থেকে সরে গেলেই তাঁদের সাঙ্গোপাঙ্গরা তার উলটো পথ ধরেন কেন? মহম্মদ সেলিমের পক্ষে তা স্বাভাবিক হতে পারে, কিন্তু শতরূপ, মীনাক্ষী, সায়ন, সৃজন, দীপ্সিতারা তো লেখাপড়া করেছেন বলেই শোনা যায়। স্মরণ করা যেতে পারে, মইনুল হাসানের প্রসঙ্গ। এই বাম নেতা মুসলমানদের দোষ ত্রুটি বিষয়ে একটি বই লিখে এমন বিপদে পড়েছিলেন যে তাঁকে অনেক কসরত করে জেহাদিদের দ্বারা প্রদত্ত ধর্মদ্রোহী বদনাম ঘোচাতে হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন ক্ষমতায় ছিলেন না তখন অনুপ্রবেশের বিরোধিতা করে লোকসভার স্পিকারের দিকে কাগজপত্র ছুঁড়ে দিয়েছেন। অবশ্য ইদানীং কেরালা, পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতে সর্বত্র তৃণমূল ও সিপিএমের অনুপ্রবেশ বিষয়ে বোঝাপড়া হয়ে গেছে। শুধু অনুপ্রবেশকারীর পক্ষে 'কারা আগে প্রাণ কে করিবে দান। তার লাগি কাড়াকাড়ি।' আর এমন অবস্থায় হিন্দু 'শুধুই ঘুমায়ে রয়'। □

পবিত্র বিবাহবন্ধন কি অদূর ভবিষ্যতে বিলুপ্তির পথে?

তনুশ্রী নাগ দাশ

আশঙ্কাটা আদৌ অমূলক নয়। কারণ ইদানীংকালে যে হারে বিবাহবিচ্ছেদ শুরু হয়েছে তাতে রুচি তথা জাগ্রত বিবেকসম্পন্ন তরুণ-তরুণীদের পক্ষে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া আশঙ্কার কারণ বই কী। আমার বিশেষ পরিচিত এমন বেশ কিছু ব্যক্তির সঙ্গে আমি কথা বলেছি— যাঁদের বিবাহযোগ্য ছেলে ও মেয়ে আছে। তাঁদের সঙ্গে গল্পের মাধ্যমে তাদের ছেলে-মেয়েদের বিবাহের প্রসঙ্গ উঠতেই তাঁরা দুঃখ করে বলেন, ও কথা আর বলবেন না দিদি, ছেলেকে বিয়ের কথা বললেই ছেলের একই কথা— তোমরা কি সংসারে আগুন জ্বালাতে চাইছো?' আবার কোনো মেয়ের মাকে বললে মেয়ে নাকি পালটা প্রশ্ন করে, 'বিয়ে করলে স্বামী ও শশুর বাড়ির লোকের দ্বারা আমার মৃত্যু হবে না এবং আমার দাম্পত্য জীবন সুখের হবে— এ গ্যারান্টি তোমরা দিতে পারবে তো?'

এখন প্রশ্ন হলো, সমাজে এত বিবাহবিচ্ছেদ কেন? বর্তমান যুব সম্প্রদায়ের অধিকাংশই তো শিক্ষিত ও সচেতন। তাঁরা তো তাদের ভালো-মন্দ বোঝেন। তাঁরা কি সুখী-সুন্দর জীবন চান না? তবে কি পরস্পর পরস্পরকে না জানাই এর কারণ? নাকি তাঁদের বিপরীতমুখী মানসিকতা? আর তাই যদি হবে তাহলে আগেকার দিনে বিবাহের আগে পাত্র-পাত্রী পরস্পরকে জানা তো দূরের কথা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরস্পরকে দেখাও সম্ভব হতো না। কারণ অভিভাবকেরাই ছেলে-মেয়ের বিবাহ ঠিক করতেন। অথচ তখন বিবাহবিচ্ছেদ ছিল বিরলতম ঘটনা। আর তা এখন ৫০ শতাংশেরও বেশি। আমরা কথা প্রসঙ্গে অনেকেই প্রায়ই গর্ব করে বলি, বিজ্ঞান এখন উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে গেছে।

আর সমগ্র পৃথিবীটাও আজ আমাদের হাতের মুঠোয়।

অবশ্যই তাই। কিন্তু আমরা বোধহয় অনেকেই ভেবে দেখিনি যে, বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে পৃথিবীকে হাতের মুঠোয় পেতে আমাদের কিন্তু চরমতম মূল্য দিতে হয়েছে। জলাঞ্জলি দিতে হয়েছে প্রেম, প্রীতি, ত্যাগ, নিষ্ঠা, সহানুভূতি, সৌভ্রাতৃত্ববোধ নামক মানব-জীবনের মূল্যবোধগুলিকে। যা আর কোনোদিনও ফিরে পাওয়া যাবে না। যার ফলশ্রুতি হিসেবে সমাজের সিংহভাগ মানুষ আজ পশ্চাতের ইন্দ্রিয়সুখসর্বস্ব ভোগবাদের শিকার এবং নারী-পুরুষ নির্বিশেষে অহংকার আর আত্মকেন্দ্রিকতার বিষে জর্জরিত। তাই 'বিবাহ বিচ্ছেদ' নামক সমাজের এই দুরারোগ্য ব্যাধিটির মূলেও কিন্তু ওই অহংকার আর আত্মকেন্দ্রিকতা। অহংকারের উৎস ছয় প্রকার। রূপের, গুণের, ধনের, পদমর্যাদার, বংশমর্যাদার ও তারুণ্যের। কিন্তু ধন আর বংশ মর্যাদাকে বাদ দিলে বাকি চারটি অহংকারের উৎসগুলির স্থায়িত্ব কতদিন? কৈশোরে প্রতিটি মানুষের মনে রঙিন স্বপ্নের প্রজাপতিগুলো ডানা মেলতে শুরু করে। যৌবনের প্রারম্ভে তা পরিপূর্ণতা পেয়ে রঙিন স্বপ্নে মানুষ বিভোর হয়। তারপর ক' বছর পরে আসে প্রৌঢ়ত্ব আর ষাট পেরোলেই শরীরে এসে উপস্থিত হয় বার্ধক্য।

তাহলে যৌবনের উন্মাদনা ক'টি মাত্র বছরের মামলা। সন্তানাদির ভবিষতের কথা চিন্তা করে নিজেদের সুখী-সুন্দর জীবন গড়ে তুলতে মানুষ কি পারেন না নিজেদের অহংকারের সংঘাতকে দূরে সরিয়ে রেখে একটু ত্যাগ, একটু সহনশীলতার দ্বারা নিজেদের ভুল বুঝাবুঝির নিরসন করতে? প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রোমানিয়ার ট্রানসিলভেনিয়ার একটি গ্রাম, নাম রিয়ারটান। সেখানে বিগত তিনশো বছরের ইতিহাস থেকে জানা গেছে, তিনশো বছরের সেখানে মাত্র একটি দম্পতিই বিবাহবিচ্ছেদ চাইলে নিয়মানুযায়ী তাঁদের কমপক্ষে ১৫ দিনের জন্য একটি নির্জন গুপ্ত কক্ষে অতিবাহিত করতে হয়। সে গুপ্ত কক্ষটিতে স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনযাপনের সব রকম ব্যবস্থা থাকলেও শোবার জন্য একটিমাত্র খাট, একটি চেয়ার আরেকটি টেবিল। অফুরন্ত অবকাশ। হয় কথা বলো, নইলে চুপচাপ থাকো। তাতে দেখা গেছে, ১৫ দিনে তারা কথা বলতে বাধ্য হয়, আর ওই সময়ের মধ্যে তাদের যাবতীয় রাগ-ক্ষোভ তথা যাবতীয় ভুল বুঝাবুঝিও অবসান হয়। সেই গুপ্ত কক্ষ থেকে ছাড়া পেয়ে সেই দম্পতি আর বিবাহ বিচ্ছেদ চাননি। দেশের বিচার ব্যবস্থা তথা উচ্চ ও সর্বোচ্চ আদালতের প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেও বলা যায়— বর্তমানে কিছু শর্তসাপেক্ষ আদালত দ্বারা স্বীকৃত 'লিভ টুগেদার' বা 'স্টে টুগেদার' আইনটি ভারতের সনাতন বৈদিক পরম্পরার সঙ্গে মোটেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। বরং ওই স্বীকৃতির দ্বারা নারী-পুরুষের দৈহিক সম্পর্ক স্থাপনকে উৎসাহিত করা হয়েছে। যা শাস্ত্রসম্মত পবিত্র বিবাহ বন্ধনকে গুরুত্বহীন করে তুলেছে। □

সিলিয়াক ডিজিজ ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

মানবদেহে যে সকল বিরল ধরনের রোগ দেখা যায় তার মধ্যে অন্যতম হলো সিলিয়াক ডিজিজ। একে সিলিয়াক স্প্রু বা গ্লুটেন সেনসিটিভ এন্টেরোপ্যাথি বলেও অভিহিত করা হয়। এই ধরনের ক্রনিক অটো-ইমিউন রোগে গ্লুটেন সমৃদ্ধ খাবার যেমন গম বা গম থেকে তৈরি আটা, বার্লি, জোয়ার ইত্যাদির তৈরি খাবার খেলে শরীরের ক্ষুদ্রান্তের ইমিউন ব্যবস্থার উপর প্রভাব পড়ে।

ক্রমাগত গ্লুটেনে অ্যালার্জি থাকা সত্ত্বেও এই খাবারগুলি খেয়ে গেলে ক্ষুদ্রান্তের আস্তরণে প্রভাব পড়তে পারে এবং এটি বেশ কিছু সৃষ্টি উপাদান শোষণ করতে পারে না ঠিকমতো। অন্ত্রের এই দুর্বলতার ফলে ডায়ারিয়া, ক্লান্তিবোধ, ওজন কমে যাওয়া, পেটফাঁপা, অ্যানিমিয়া থেকে শুরু করে আরও জটিল অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। বাচ্চাদের মধ্যে সমস্ত পুষ্টি উপাদান যদি ঠিকমতো শরীর শোষণ করতে না পারে তাহলে তাদের বিকাশ সঠিকমাত্রায় হয় না।

কেন হয়? জিনগত মিউটেশন ও গ্লুটেনসমৃদ্ধ খাবারের প্রতি সংবেদনশীলতা সিলিয়াক ডিজিজের প্রাথমিক কারণ বলে চিকিৎসকরা চিহ্নিত করলেও এর উৎস কী সেটা এখনো পর্যন্ত জানা যায়নি। বাচ্চাদের স্তন্যপানের সময়ে কোনো ত্রুটি থাকলে, গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল সমস্যা, অন্ত্রে ভালো ব্যাকটেরিয়ার অনুপস্থিতিকে অন্যান্য কারণগুলির মনে রাখা হয়েছে। অনেক সময়ে কোনো অপারেশনের পরে, গর্ভাবস্থায়, সন্তান জন্মদানের পরে, ভাইরাল আক্রমণ বা মারাত্মক মানসিক চাপের ফলে সিলিয়াক ডিজিজ বেড়ে যায়।

গ্লুটেনসমৃদ্ধ খাবার খেলে শরীরের রোগ প্রতিরোধক ব্যবস্থা যখন অতিরিক্ত মাত্রায় প্রতিক্রিয়া দেখাতে শুরু করে, তখন ক্ষুদ্রান্তের সরু সরু ঝিল্লি (চিকিৎসার পরিভাষায় একে বলা হয় ভিলাস, বহুবচনে ভিলাই)-র উপর এর প্রভাব পড়ে। এই ভিলাইগুলি খাবার থেকে ভিটামিন, মিনারেলস ও অন্যান্য পুষ্টি উপাদান শোষণ করতে সাহায্য করে। সিলিয়াক ডিজিজের ফলে ভিলাই দুর্বল হয়ে পড়লে শরীর প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান থেকে বঞ্চিত হয়।

কোন কোন উপসর্গ দেখে রোগটিকে চিহ্নিত করবেন?

প্রাপ্তবয়স্কদের উপসর্গ : সিলিয়াক ডিজিজের উপসর্গ বড়োদের ও ছোটোদের মধ্যে আলাদা হয়। প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে হজম সংক্রান্ত যেসকল সমস্যা দেখা যায়, সেগুলি হলো— ডায়ারিয়া, অত্যধিক ক্লান্তিবোধ, কোনো কারণ ছাড়াই ওজন কমে যাওয়া, পেটফাঁপা ও গ্যাস, পেটব্যথা, গা বমি বমি ভাব ও বমি করে ফেলা, ক্ষেত্রবিশেষে কোষ্ঠকাঠিন্য। অনেকের ক্ষেত্রে এর বাইরেও কয়েকটি লক্ষণ থাকে যেমন আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া, হাড়ের ঘনত্ব কমে যাওয়া (অস্টিওপোরোসিস), হাড় নরম হয়ে যাওয়া (অস্টিওম্যালেশিয়া), ত্বকে চুলকানি, লাল লাল দাগ (ডার্মাটাইটিস হারপেটিফরমিস), জিহ্বায় ঘা, মাথাব্যথা, শরীরের কোনো অংশ অসাড় হয়ে যাওয়া, শরীরের ভারসাম্য রাখতে অসুবিধা হওয়া, চেতনাশক্তির ক্ষয়, অস্থিসন্ধিতে ব্যথা, প্লীহার কার্যকারিতা কমে যাওয়া (হাইপোস্প্লেনিজম)।

বাচ্চাদের যেসকল উপসর্গ দেখা যায়

গা বমি বমি ভাব বা কখনো কখনো বমি চাপতে না পারা, ক্রনিক ডায়ারিয়া, পেট ফুলে যাওয়া, কোষ্ঠকাঠিন্য, পেটে প্রচণ্ড গ্যাস, বাওয়েলে দুর্গন্ধ। এছাড়া পুষ্টি উপাদান ঠিকমতো শোষণ না হওয়ার ফলেও কয়েকটি সমস্যা দেখা যায়। দাঁতের এনামেল ভঙ্গুর হয়ে যায়, ওজন কমে যাওয়া, অ্যানিমিয়া, খিটখিটে স্বভাব, উচ্চতা না বাড়া, পিউবার্টি দেরি করে হয়, অ্যাটেনশন ডেফিসিট হাইপারঅ্যাকটিভ ডিসঅর্ডার (এডিএইচডি) হয়, খিঁচুনি ও কোনো কিছু শিখতে স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি সময় নেয়।

শরীরে গ্লুটেন ইনটলারেন্স হলে সেখানে থেকে হওয়া ডার্মাটাইটিস হারপেটিফরমিসের কারণে ত্বকেও সমস্যা হয়। ত্বকে চুলকানি, দাগ, র‍্যাশ বেরোয়। হাঁটু, পায়ের পাতা, মাথা ও স্তনে এই র‍্যাশগুলি বের হয়। গ্লুটেন ফ্রি ডায়েটে, কিংবা ওষুধ দিয়ে এর চিকিৎসা করা হয়।

রিস্ক ফ্যাক্টর তৈরি হয় যদি পরিবারের কোনো সদস্যের সিলিয়াক ডিজিজ বা ডার্মাটাইটিস হারপেটিফরমিসের ইতিহাস থাকে, বিশেষত যাদের টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিস ইতিমধ্যেই আছে বা কেউ যদি আগে থাকতেই ডাউন সিনড্রোম বা টার্নার সিনড্রোমে আক্রান্ত হন। অটোইমিউন থাইরয়েড ডিজিজ, মাইক্রোস্কোপিক কোলাইটিস ও অ্যাডিসন ডিজিজের রোগীদের রিস্ক ফ্যাক্টর রয়েছে।

সিলিয়াক ডিজিজ থেকে কী কী জটিলতা হতে পারে

অপুষ্টি : এটা হয় যখন আপনার ক্ষুদ্রান্ত্র খাবার থেকে পর্যাপ্ত পুষ্টি উপাদান শোষণ করতে পারে না। এখন থেকেই অ্যানিমিয়া ও ওজন কমার সমস্যা হয়। বাচ্চাদের বিকাশের ক্ষেত্রে ও উচ্চতার ক্ষেত্রেও তা বাধা দেয়।

হাড় দুর্বল হলে : ভিটামিন ডি ও ক্যালসিয়ামের শোষণ ঠিকমতো না হওয়ায় হাড় ভঙ্গুর, রিকেট হতে পারে, হাড়ের ঘনত্ব কমে যেতে পারে।

বন্ধ্যাত্ব ও গর্ভপাত : ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন ডি-র শরীরে অভাব হলে সেখান থেকে বন্ধ্যাত্ব ও গর্ভপাতের মতো ঘটনা ঘটাও কোনো বিষয় নয়।

ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স : শরীরে ক্ষুদ্রান্ত্রের ড্যামেজ হয়ে গেলে সেখান থেকে পেটব্যথা হতে পারে ও ল্যাকটোজ সমৃদ্ধ ডেয়ারি প্রোডাক্ট খাওয়ার পরে ডায়ারিয়া হতে পারে। ক্ষুদ্রান্ত্র সেরে গেলে ডেয়ারি প্রোডাক্ট শরীর হজম করতে পারে।

ক্যানসার : যাদের সিলিয়াক ডিজিজ আছে তারা যদি গ্লুটেনবিহীন খাবার না খায়, তাহলে তাদের নানা রকমের ক্যানসার হতে পারে যেমন ইন্টেস্টিনাল লিম্ফোমা ও স্মল বাওয়েল ক্যানসার।

স্নায়ুগত সমস্যা : সিলিয়াক ডিজিজ আছে তারা স্নায়ুগত সমস্যা ধরে যাওয়াও আশ্চর্যের নয়, যেমন। খিঁচুনি, আচমকাই হয়তো কারও খিঁচুনি, পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি ইত্যাদি হয়ে বসল।

রোগনির্ণয় সেরোলোজি টেস্টিং : এতে রক্তের নির্দিষ্ট কিছু অ্যান্টিবডির পরীক্ষা করিয়ে দেখা হয় গ্লুটেন শরীরের কতটা বিরোধী। জেনেটিক টেস্টিংও করা হয়। এছাড়া এন্ডোস্কোপি করিয়ে ক্ষুদ্রান্ত্রের ছবি তুলে দেখা যায় ক্ষুদ্রান্ত্র ঠিক কতটা ও কোথায় কোথায় ড্যামেজ হয়েছে।

বিপ্লবী লীলা রায়ের ১২৫তম জন্মবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা

গত ২১ নভেম্বর নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সহযোদ্ধা বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা রায়ের ১২৫তম জন্মবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত হয় একটি আলোচনা সভা, স্মরণিকা প্রকাশ এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। এদিন 'বিপ্লবী লীলা রায়ের ১২৫তম জন্মবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটি'র উদ্যোগে মধ্য কলকাতা-স্থিত বিপ্লবী লীলা রায় সভাঘরে এই অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয়। দেশাত্মবোধক গানের মাধ্যমে এদিনের অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। অসংখ্য দেশপ্রেমিক মানুষের সমাগমে সভাগৃহটি ছিল এদিন পরিপূর্ণ। অনুষ্ঠানমঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজকর্মী ডলি রায়, ইন্দ্রাশিস ভট্টাচার্য, এনএসএইচএম ইনস্টিটিউট অফ মিডিয়া অ্যান্ড ডিজাইনের অধ্যাপিকা কঙ্কণা ঘোষ, তারাসুন্দরী বালিকা বিদ্যাভবনের শিক্ষিকা মোনালিসা মাইতি, বিশিষ্ট লেখক ও নেতাজী গবেষক সৌম্যব্রত দাশগুপ্ত প্রমুখ বিশিষ্টজন। অতিথিদের বরণ অনুষ্ঠানের পর তাঁরা তাঁদের বক্তব্যের মাধ্যমে স্মরণ করেন ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্লবী, দেশনেত্রী লীলা রায় ও বিপ্লবী, দার্শনিক অনিল রায়ের অংশগ্রহণ, তাঁদের গড়ে তোলা সংগঠন, নারীদের ক্ষমতায়ন ও স্বদেশ মুক্তির লক্ষ্যে তাঁদের আত্মত্যাগ ও অবদানের ইতিহাস। স্বামী বিবেকানন্দ ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের স্বদেশ চেতনার আলোকে নতুন ভারত ও নবপ্রজন্ম উদ্ভাসিত হোক— এই আশা তাঁরা প্রকাশ করেন। স্বাধীনতা পরবর্তী পর্বে ভারত ও পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘ সময় ধরে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলগুলি যে, নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও তাঁর সহযোদ্ধাদের মূল্যায়ন করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল— সেকথাও উঠে আসে এদিনের আলোচনা সভায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা বিপ্লবী, দেশনেত্রীর ১২৫তম জন্মবর্ষ স্মরণে একটি 'স্মরণিকা' গ্রন্থ প্রকাশ করেন। 'আমার কথা'-শীর্ষক একটি কবিতা আবৃত্তি করে শোনান যূথিকা মজুমদার। বিপ্লবী লীলা রায়ের ১২৫তম জন্মবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটির উদ্যোগে বিগত কয়েক মাস ধরে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে আয়োজিত হয় বিপ্লবী, দেশনেত্রী লীলা রায়ের জীবনী সংক্রান্ত প্রবন্ধ রচনা প্রতিযোগিতা এবং বক্তৃতা প্রতিযোগিতা। 'বক্তৃতা প্রতিযোগিতা'র বিষয় ছিল— 'স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতাজী অনুগামী মহিলাদের ভূমিকা'। এই দু'টি প্রতিযোগিতায় শীর্ষ স্থানাধিকারীদের এদিন অনুষ্ঠানমঞ্চে পুরস্কৃত করা হয়। নেতাজী সুভাষচন্দ্র রচিত 'দ্য ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল্', 'অ্যান ইন্ডিয়ান পিলগ্রিম'-সহ বিভিন্ন বইপত্র ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে তুলে দিয়ে তাদের উৎসাহিত করেন সম্মানীয় অতিথিরা।

এরপর ছাত্র-ছাত্রীদের একটি নৃত্যানুষ্ঠানের পর সমবেত কণ্ঠে রবীন্দ্র সংগীত 'ও আমার দেশের মাটি'র মধ্যে দিয়ে এদিনের অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

সিউড়ীতে 'শ্রদ্ধা'র ১৬৭তম শ্রদ্ধা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান

সিউড়ী তথা বীরভূম জেলার সংস্থা প্রখ্যাত সামাজিক 'শ্রদ্ধা' ২০০৮ থেকে আজ পর্যন্ত ১৬৭ জন সহস্র পূর্ণচন্দ্র দর্শনকারীকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে। গত ১৬ নভেম্বর সিউড়ীর সাঁইথিয়া বাইপাসের আদিত্য পরিবারের ৯৩ বছরের উল্লাসিনী আদিত্য মহোদয়াকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। ব্রহ্মনাদের মাধ্যমে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন 'শ্রদ্ধা' সংস্থার সভাপতি মহাদেব মুখোপাধ্যায়। প্রদীপ প্রজ্বলন করেন পূজ্যপাদ স্বামী বরদানন্দ মহারাজ। উল্লাসিনী দেবীকে পূজন করেন তাঁর ছোটো বৌমা রিঙ্কু আদিত্য। তাঁকে মাল্য নিবেদন করেন কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায় এবং মানপত্র পাঠ করেন 'শ্রদ্ধা'র সহ-সভাপতি আগমানন্দ মুখোপাধ্যায়। 'শ্রদ্ধা' সংস্থার উদ্দেশ্যের বিষয়ে বলেন সংস্থার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। অর্ঘ্য হিসেবে উল্লাসিনী দেবীকে উত্তরীয়, বস্ত্র, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ফল ও মিষ্টান্ন নিবেদন করেন অনুভবী সুজাতা বিষ্ণু, রীনা বন্দ্যোপাধ্যায়, মালতী ঘোষ ও শুভ্রা বন্দ্যোপাধ্যায়। আরতি করেন বন্দনা দাস। অনুভব কথনে ছিলেন অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ আদিত্য ও শুভেন আদিত্য এবং উল্লাসিনী দেবীর মেয়ে ও বৌমারা। সংগীত পরিবেশন করেন অসীমা মুখোপাধ্যায়, রূপালী ঘোষাল ও দেবাঞ্জন আদিত্য। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন অধ্যাপিকা চৈতালী মিশ্র। শান্তি মন্ত্রোচ্চারণ করেন 'শ্রদ্ধা'র প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক লক্ষ্মণ বিষ্ণু। অনুষ্ঠান সঞ্চালক ছিলেন শিক্ষক ও সাংবাদিক পতিত পাবন বৈরাগ্য। পরিশেষে আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী নিয়ে মোট ১৫০ জনকে নিষ্ঠা সহকারে নৈশভোজে আপ্যায়িত করেন আইটিআই কলেজের বর্তমান উপাধ্যক্ষ রবীন্দ্রনাথ আদিত্য এবং তাঁর পরিবারবর্গ।

কলকাতার বিশিষ্ট মহিলা সংস্থা 'মনীষা'-র উদ্যোগে গত ১৮ নভম্বর ভারতীয় সংস্কৃতি পরিষদ সভাগারে 'জহাঁ সুমতি তহাঁ সম্পত্তি নানা' শীর্ষক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। মুখ্য বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট হিন্দি সাহিত্যিক ড. তারা দূগড়। সভায় উপস্থিত ছিলেন সর্বশ্রীমতী জ্যোতি বিড়লা, সরোজ গোয়েল, পুষ্পা গর্গ, রেখা লাঠ, লতা লোহিয়া, নীতা আগরওয়াল-সহ বহু গণ্যমান্য মাতৃশক্তি। সভায় স্বাগত ভাষণ দান ও সভা সঞ্চালনা করেন মনীষার অধ্যক্ষা শ্রীমতী ঊষা মোদী এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন মনীষার মন্ত্রী শ্রীমতী জ্যোতি কন্দোই ও শশি কঙ্কানী।

কোয়েম্বাটুরে সংস্কৃতভারতী’র ‘অখিল ভারতীয়ম্ অধিবেশনম্’

সংস্কৃতভারতীর আহ্বানে গত ৭ থেকে ৯ নভেম্বর তামিলনাড়ু রাজ্যের কোয়েম্বাটুরে ‘অমৃতা বিশ্ব বিদ্যাপীঠ’ বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতভাষী কার্যকর্তাদের নিয়ে ‘অখিল ভারতীয়ম্ অধিবেশনম্’ অনুষ্ঠিত হয়। সমগ্র দেশের বিভিন্ন বিকাশ খণ্ড (ব্লক) তদূর্ধ্ব চার হাজারের বেশি কার্যকর্তা এই অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন। ৭ নভেম্বর সকাল ৭টায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সমবেতকণ্ঠে বন্দে মাতরম সংগীতের মাধ্যমে শুরু হয়। পরে সকলে সমবেতকণ্ঠে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বাদশ অধ্যায় পাঠ করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বামী কামাক্ষীদাস মহারাজ এবং পূজ্য তপস্যানন্দামৃতাপুরী মহারাজ। প্রধান বক্তা রূপে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবলেজী। তিনি নিজেকে

সংস্কৃতভারতীর একজন কার্যকর্তা বলে স্বীকার করেন। তিনি বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে কেবলমাত্র সংস্কৃতের প্রশংসা নয়, সকলের ভারতের দেবভাষা সংস্কৃত শেখা ও কথা বলা উচিত। ভারতকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করতে সংস্কৃতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ড. বাবাসাহেব আম্বেদকর সংবিধান সভায় সংস্কৃতকে ভারতের রাজভাষা করার জন্য জন্য প্রস্তাব রেখেছিলেন। পণ্ডিত নেহরু পর্যন্ত একে ভারতবাসীর গর্ব এবং একে রক্ষার কথা বলেছিলেন। এরপরে সংস্কৃতভারতী প্রকাশিত দশটি পুস্তক উন্মোচন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শুরুতেই মাতা অমৃতানন্দময়ী এবং শৃঙ্গেরীমঠের পূজ্য শঙ্করাচার্যের আশীর্বচন দৃশ্য-শ্রাব্যের মাধ্যমে প্রদর্শিত হয়। উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃভারতীর অখিল ভারতীর অধ্যক্ষ প্রফেসর গোপবন্ধু মিশ্র, উপাধ্যক্ষ শ্রীমতী অমৃতা পৃথ্বী এবং সম্পাদক সত্যনারায়ণ ভট্ট।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশাল পরিসর ও মনোরম পরিবেশ সকলের মনকে আকৃষ্ট করে। সেখানে এক বিশাল সংস্কৃত প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। কলকাতা থেকে আগত এক নৃত্যগোষ্ঠীর নৃত্য পরিচালনা সকলকে মুগ্ধ করে। উল্লেখ্য, তিনদিনে পাঁচ লক্ষ টাকার সংস্কৃত পুস্তক বিক্রি হয়েছে। অধিবেশনে আগামী তিন বছরের জন্য অখিল ভারতীয় সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন দিল্লি লালাবাহাদুর শাস্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বতন উপাচার্য প্রফেসর রমেশ কুমার পাণ্ডে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে তিনশতাধিক কার্যকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

With Best Compliments from-
A
Well Wisher

সুরেন্দ্র চন্দ্র বসাকের
অত্যাধুনিক গয়নার
ডিজাইনের ক্যাটালগ
সুপার
যে কোন স্বর্ণকারকে দেখাতে বলুন
ক্যাটালগের জন্য যোগাযোগ করুন
9830950831

Today's Choice.....
Vandana
SAREES • SUITS • BEDSHEETS
Mfg. of Cotton Printed & Embroidery
Sarees & Bedsheets (Always Exclusive)
Cont. No. 033-2270 0476, 9432290475

শিলিগুড়ির শালবাড়িতে রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমিতির কেন্দ্রীয় সম্মেলন

গত ২৬ অক্টোবর 'এক ছাতা,এক নিশান, এক বিধান'— এই লক্ষ্য সামনে রেখে শিলিগুড়ির শালবাড়ি কল্যাণ আশ্রমে সারা দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত হয় ক্ষত্রিয় সমিতির কেন্দ্রীয় সম্মেলন। প্রথমেই সমিতির পতাকা উত্তোলন করেন শিলিগুড়ির বিশিষ্ট সমাজসেবী ও প্রবীণ সদস্য সুরেন্দ্রনাথ বর্মণ। তারপর মনীষী রায়সাহেব ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা, ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ও ভারতমাতার পদমূলে দীপ প্রজ্বলন করেন পদ্মশ্রী পুরস্কারপ্রাপ্ত বিশিষ্ট কবি নগেন্দ্রনাথ রায় । অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা সকলেই ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা, ভগবান শ্রীরাম ও ভারতজননীর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন। সমবেতভাবে উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন রায়গঞ্জ সারদা শিশুতীর্থের আচার্য্য গৌতম বর্মণ।

প্রাস্তবিক ভাষণ দেন ক্ষত্রিয় সমিতির কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক সৌমেন রায়। সমস্ত অতিথিদের পরিচয় করিয়ে দেন সমিতির কেন্দ্রীয় সম্পাদক প্রেমানন্দ অধিকারী। এই মহতী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অবসরপ্রাপ্ত এসডিও ও জয়েন্ট সেক্রেটারি— অমল কান্তি রায়, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের ডিন এবং আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য, এফআরএসসি (লন্ডন), অধ্যাপক ড. মহেন্দ্রনাথ রায়, ঠাকুর রায়সাহেব পঞ্চানন বর্মার বংশের সদস্য, রায়সাহেবের সম্পর্কে নাতি তিমির কুমার বর্মা, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক ড. পরিমল রায়, শিলিগুড়ির কাউন্সিলর দিলীপ বর্মণ, মাটিগাড়ার বিধায়ক আনন্দ বর্মণ, গাজোলের বিধায়ক চিন্ময় দেববর্মণ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক দিলীপ ভকত, শিলিগুড়ির বিভাগ প্রচারক প্রভাত পাত্র-সহ আরও অনেক বিশিষ্টজন। এদিনের সম্মেলনে মনোগ্রাহী বক্তব্য রাখেন অমল কান্তি রায়, ড. মহেন্দ্রনাথ রায়, তিমির কুমার বর্মা, পদ্মশ্রী পুরস্কারপ্রাপ্ত কবি নগেন্দ্রনাথ রায়, বিধায়ক আনন্দ বর্মণ,মালদা গাজোলের বিধায়ক চিন্ময় দেববর্মণ ও বিশিষ্ট সমাজসেবী দিলীপ ভকত।

দ্বিতীয় সত্রে সাংগঠনিক আলোচনা এবং কিছু সাংগঠনিক দায়িত্ব ঘোষণা করা হয়। কোচবিহার থেকে ৪৫ জন, জলপাইগুড়ি থেকে ৪৫ জন, মালদহ থেকে ১৪ জন, উত্তর দিনাজপুর থেকে ১৪ জন, দক্ষিণ দিনাজপুর থেকে ৩ জন, দার্জিলিং ও শিলিগুড়ি থেকে ৪০ জন, আলিপুরদুয়ার থেকে ৭ জন, মোট ১৬৮ জন প্রতিনিধি এই মহতী সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। যাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে এই সম্মেলন সফল হয়, তিনি সবশেষে উপস্থিত সকলের উদ্দেশে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি হলেন ক্ষত্রিয় সমিতির কেন্দ্রীয় সভাপতি ভবানী চরণ সিংহ। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শ্যামল রায়।

নরেন্দ্রপুরে স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের ক্ষেত্রীয় বৈঠক

গত ১৫-১৬ নভেম্বর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নগেন্দ্রপুর-স্থিত একল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে দুদিনের ক্ষেত্রীয় বৈঠক সম্পন্ন হলো।

উপস্থিত ছিলেন স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের অখিল ভারতীয় সংগঠন সম্পাদক শ্রী কাশ্মীরিলালজী, অখিল ভারতীয় সহ সংযোজক ড. ধনপতরাম আগরওয়াল, অখিল ভারতীয় সংঘর্ষ বাহিনী প্রমুখ অন্নদাশঙ্কর পাণিগ্রাহী, পূর্বক্ষেত্র সংযোজক আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এবং স্বাবলম্বী ভারত অভিযানের পূর্বক্ষেত্র সমন্বয়ক সারদাপ্রসাদ সৎপথী।

বৈঠকে দক্ষিণবঙ্গ, মধ্যবঙ্গ, উত্তরবঙ্গ ও সিকিম এবং পূর্ব ও পশ্চিম ওড়িশা মিলিয়ে মোট ৩০ জন কার্যকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

সঙ্ঘ শতবর্ষ উপলক্ষ্যে খড়্গাপুরে বিশিষ্ট নাগরিক সম্মেলন

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শতবর্ষ উপলক্ষ্যে স্বয়ংসেবকদের আহ্বানে গত ১৬ নভেম্বর খড়্গাপুরে অনুষ্ঠিত হয় 'বিশিষ্ট নাগরিক সম্মেলন'। খড়্গাপুর শহরের গুজরাতি মিত্র মণ্ডল মেহতা হলে এদিন

সুচারুভাবে সম্পন্ন হয় এই সম্মেলন। 'মিনি ভারত' নামে খ্যাত খড়্গাপুর শহরে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে এদিন উপস্থিত ছিলেন আইআইটি এবং অন্যান্য মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও গবেষক, রেলের অনেক ইঞ্জিনিয়ার এবং অবসরপ্রাপ্ত অনেক রেল আধিকারিক, সাংবাদিক, স্কুল শিক্ষক এবং অনেক সমাজকর্মী। এদিন প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। সঙ্ঘের শতবর্ষের উপলব্ধি সংক্ষেপে বিবৃত করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সহ-সম্পর্ক প্রমুখ সুনীল দেশপাণ্ডে। শতাব্দীবর্ষে সঙ্ঘ যে পঞ্চ পরিবর্তনের মাধ্যমে দেশ ও সমাজ জাগরণের সংকল্প গ্রহণ করেছে, তা ব্যাখ্যা করেন সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গপ্রান্ত প্রচারক প্রশান্ত ভট্ট।

প্রবুদ্ধ নাগরিকদের অনেক প্রশ্নের উত্তর দেন সুনীল দেশপাণ্ডে। সঙ্ঘের কার্যক্রমে প্রথমবার আসা অনেক ব্যক্তি এদিনের অনুষ্ঠানকে 'অভূতপূর্ব' আখ্যা দেন। অন্য কোনো জায়গা থেকে না শুনে, সঙ্ঘের কাছে এসে সঙ্ঘকে জানার আহ্বান জানান শ্রীদেশপাণ্ডে। ৩২ জন মাতা-ভগ্নী-সহ মোট ২৭৬ জন প্রবুদ্ধ নাগরিক এদিনের সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলন সঞ্চালনা করেন সঙ্ঘের খড়্গাপুর নগর বৌদ্ধিক প্রমুখ অর্ক সাঁতরা এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন প্রবীণ স্বয়ংসেবক সুতনু সাঁতরা।

চন্দ্রকোণা রোড খণ্ডে সঙ্ঘের সামাজিক সদ্ভাব বৈঠক

গত ১৫ নভেম্বর মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণা রোড খণ্ডে সারদা শিশু মন্দিরে ১৬টি বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর প্রমুখদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শতবর্ষে তৃতীয় কার্যক্রম— 'সামাজিক সদ্ভাব' বৈঠক। সমাজের সদর্থক পরিবর্তনের জন্য সাতটি কার্যক্রম গ্রহণ করেছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। তার মধ্যে 'সামাজিক সদ্ভাব' অন্যতম। সমাজের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক সমরসতার ভাব জাগরণের উদ্দেশ্যে এই বৈঠক সারা দেশে আয়োজন করা হয়েছে। ভারতবাসী সকলেই হিন্দু, তাঁরা সকলেই ভারতমাতার সন্তান। সমানতাই ভারতের মূলমন্ত্র। ভারতমাতার শ্রীচরণে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ এবং ভগবান বীরসা মুণ্ডার জন্মদিনে তাঁর ছবিতে মাল্যদান করে এদিনের বৈঠক শুরু হয়।

এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর সদস্য অদ্বৈত চরণ দত্ত এবং মেদিনীপুর জেলা সঙ্ঘচালক আশিস কুমার পান।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলার সহ-বৌদ্ধিক প্রমুখ তপন মণ্ডল ও জেলা কার্যবাহ রাজু ঘোষ। জাতিভেদ ও জাতি বৈষম্য কীভাবে দূর করা সম্ভব হবে, সেই বিষয়টি পর্যালোচনা ছাড়াও হিন্দুসমাজের নানা সমস্যা নিয়ে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তি বা জাতিগোষ্ঠীপ্রমুখরা এদিন বিস্তারিত আলোচনা করেন।

শিলিগুড়ি মাধব ভবনে 'NEST ভারত'-এর যুবতী সম্মেলন

গত ১৬ নভেম্বর শিলিগুড়ির মাধব ভবনে অনুষ্ঠিত হলো '**NEST** ভারত'-এর উদ্যোগে যুবতী সম্মেলন-২০২৫-২৬। উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির বিশিষ্ট আইনজীবী সুশ্রী দীপিকা পাল। প্রধান বক্তা হিসেবে ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যাকারিণীর সদস্য ড. মনমোহন বৈদ্য। এছাড়াও ছিলেন রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি প্রবীণ কার্যকর্ত্রী শ্রীমতী শান্তা পাল, বিবেক সরাফ, লক্ষ্মণ বনসল এবং ভোলানাথ চক্রবর্তী।

নিবেদিতা এনডেভর ফর সোশ্যাল ট্রান্সফরমেশন (**NEST**) ভারত-এর সম্মেলনে ১৫ থেকে ৩৫ বছর বয়সের ৯২ জন মাতা-ভগিনী অংশগ্রহণ করেন। প্রধান বক্তা শ্রীবৈদ্য ভারতের সংস্কৃতি, ধর্ম, রাজনীতি, খেলা, বিজ্ঞান, স্বাধীনতা আন্দোলন, শিক্ষা, শাসন প্রভৃতি সমস্ত ক্ষেত্রের বীরাঙ্গনা যেমন মা সারদা, মীরাবাঈ, রানি আবাক্কা, রানি অহল্যাবাঈ, রানি রাসমণি, ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈ, মাতঙ্গিনী হাজরা, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, মহারানি রুক্মিণীদেবী, শ্রীমতী শকুন্তলা দেবী, বর্তমান রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, কিরণ বেদী, উইং কমান্ডার ব্যোমিকা সিংহ, কর্নেল সোফিয়া কুরেশি ও রিচা ঘোষের মতো ব্যক্তিত্বের মহিলাদের উদাহরণ দিয়ে প্রেরণাদায়ী বক্তব্য রাখেন। রাষ্ট্র নির্মাণ ও সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মাতৃশক্তির ভূমিকা নিয়েও বিশেষ চর্চা হয়। অনুষ্ঠানে সংকল্প গ্রহণে বলা হয়--'ভারতকে জানো, ভারতকে মানো, ভারতীয় হও এবং ভারতকে গড়ে তোলো।'

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শতবর্ষ উপলক্ষ্যে গত ১৫ নভেম্বর শিলিগুড়ির মাল্লাবাড়ি অকশন হলে প্রমুখ নাগরিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। শিলিগুড়ি সহ বিভাগ সঙ্ঘচালক সুনীল শাহ, শিলিগুড়ি মহানগর প্রচার প্রমুখ তপন মণ্ডল, মহানগর সহ সম্পর্ক প্রমুখ মনীশ আগরওয়াল এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সভাপতি লক্ষ্মণ বনসল প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। সম্মেলনের সঞ্চালিকা ছিলেন শ্রীমতী সুজাতা ধীরাসারিয়া। অনুষ্ঠানের শুরুতে সঙ্ঘের শতবর্ষ যাত্রার একটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

বেহালা বিবেকানন্দ পাঠচক্র আয়োজিত ‘বিজয়া সম্মেলন’

গত ৯ নভেম্বর, ৭৫ বছরের ঐতিহ্যবাহী--- ঠাকুরপুকুর বিবেকানন্দ কলেজের পদার্থবিদ্যা বিভাগের গ্যালারি মুখরিত হয়ে ওঠে বেহালা বিবেকানন্দ পাঠচক্রের পক্ষ থেকে আয়োজিত এক সৌহার্দ্যময় ও সুরম্য ‘বিজয়া সম্মেলন’ অনুষ্ঠানকে ঘিরে। আনন্দোচ্ছল তথা মনোজ্ঞ এই সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার শুভারম্ভ হয় এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার, গোলপার্কের মিউজিয়াম ভারপ্রাপ্ত স্বামী সুমনসানন্দ মহারাজের করকমলে প্রদীপ প্রজ্বলন এবং বেহালা বিবেকানন্দ পাঠচক্রের তরুণ সদস্য-সদস্যা,যথা সাগ্নিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্বেষা সরকার ও সুকন্যা সরদারের কণ্ঠে স্তোত্রপাঠের মধ্য দিয়ে। তারপর বেহালা বিবেকানন্দ পাঠচক্রের সম্পাদক সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের হৃদয়স্পর্শী স্বাগত ভাষণের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিক কার্যক্রমের সূচনা হয়। এর পরবর্তী পর্যায়ে বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী দেবীপ্রসাদ রায়ের আবেগঘন কণ্ঠে পরিবেশিত হৃদয়গ্রাহী উদ্বোধনী সংগীতের মধ্য দিয়ে যেন অনুরণিত হয় অনুষ্ঠানটির মূল সুর। এছাড়া, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজির অধ্যাপক ড. শ্রিয়ঙ্কর আচার্য্যের ভক্তিমগ্ন ও সমধুর কণ্ঠে পরিবেশিত পদাবলী কীর্তন একদিকে যেমন শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিমুগ্ধ করে, অপরদিকে তাঁর টপ্পা গায়নের রাগনৈপুণ্যে মুগ্ধাবিষ্ট দর্শককুলের সাধুবাদে প্লাবিত হয় সমগ্র সভাকক্ষ। অতঃপর সৌরভ মুখোপাধ্যায় ও মৈনাক চট্টোপাধ্যায়ের আবেগতাড়িত আবৃত্তি পরিবেশনা ও সুদীপ ঘোষের অসাধারণ পাঠের মধ্য দিয়ে যেন ফুটে উঠেছিল পাঠচক্রের সদস্যদের দ্বারা নিবেদিত প্রাণের ছোঁয়া। সর্বোপরি, পূজনীয় মহারাজের জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতার মধ্য দিয়ে সকলে অবগত হন শুভ বিজয়ার তাৎপর্য। এক নবচেতনার আলোকে উদ্ভাসিত হয় প্রতিটি হৃদয়।

মহারাজ তাঁর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেন স্বামীজীর সেই চিরন্তন বাণী, যা নিজের অন্তর্নিহিত দেবত্ব জাগরণের কথা বলে। পরিশেষে, বেহালা বিবেকানন্দ পাঠচক্রের সভাপতি স্বপন কুমার ঘোষের মনোগ্রাহী বক্তব্য প্রদান ও পাঠচক্রের একনিষ্ঠ সদস্য অশোক দাসের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা নিবেদনের মধ্য দিয়ে এদিনের অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে। সমগ্র অনুষ্ঠানটির সুষ্ঠু ও সুনিপুণ পরিচালনা করেন কুমারী অন্বেষা সরকার।

ব্রহ্মচারী জ্যোতির্ময় সরস্বতী শিশু মন্দিরের বোন ঐশিকা মাঝি মুর্শিদাবাদ জেলার কাশিমবাজার শিশু মন্দিরে অনুষ্ঠিত বিদ্যাভারতী পূর্বক্ষেত্রের গণিত বিজ্ঞান মেলায় প্রথম স্থান অধিকার করে গত ১৩ থেকে ১৬ নভেম্বর উত্তরপ্রদেশের মীরাটে অনুষ্ঠিত অখিল ভারতীয় বিজ্ঞান মেলায় অংশগ্রহণ করে। সেখানে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে আগত ৪৭৬ জন খুদে বিজ্ঞানী ভাই-বোনেদের মধ্যে ঐশিকা তার বিজ্ঞান মডেলের প্রদর্শন ও উপস্থাপনার মাধ্যমে সর্বভারতীয় প্রতিযেগিতায় তৃতীয় স্থান অধিকার করে।

চাঁচলে 'প্রমুখ নাগরিক সম্মেলন'

গত ১৬ নভেম্বর উত্তর মালদহ জেলার চাঁচল নগরের বিবেকানন্দ শিশু মন্দিরে আয়োজিত হয় 'প্রমুখ নাগরিক সম্মেলন'। এই কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গ প্রান্ত কার্যকারিণীর সদস্য সাধন কুমার পাল ও অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের জেলা সভানেত্রী শ্রীমতী মধুছন্দা মণ্ডল। কার্যক্রমের শুরুতে সমবেত কণ্ঠে 'ধনধান্য পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা' গানটি হওয়ার পর প্রদীপ প্রজ্বলন এবং ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করা হয়। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উৎপত্তির সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত এবং সঙ্ঘের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে, সঙ্ঘের পক্ষ থেকে সমাজের প্রতি 'পঞ্চ পরিবর্তন'-এর বার্তা উপস্থাপন করেন শ্রীপাল। পরবর্তী বক্তা শ্রীমতী মধুছন্দা মণ্ডল তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে ভারতীয় নারীশক্তির জাগরণ এবং ভারতীয় নারী সমাজের অতীত গৌরবের ইতিহাস এবং তাঁদের বর্তমান অবস্থা তুলে ধরেন। প্রশ্নোত্তরের কার্যক্রম শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন মালদহ জেলা সঙ্ঘচালক দেবব্রত কুমার দাস। এদিনের অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সামাজিক সমরসতা সহ-বিভাগ সংযোজক দীপক চট্টোপাধ্যায়। সমবেত কণ্ঠে রাষ্ট্রগীত 'বন্দে মাতরম্'-এর মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি হয়।

সংস্কৃতভারতী দক্ষিণবঙ্গের সপ্তদিবসীয় প্রশিক্ষণ বর্গ

সংস্কৃতভারতী দক্ষিণবঙ্গের আয়োজনে গত ১০ থেকে ১৭ অক্টোবর সাতদিনের আবাসিক প্রশিক্ষণ বর্গ অনুষ্ঠিত হলো হাওড়া জেলার তাঁতিবেড়িয়া সারদা শিশু মন্দিরে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ সবপ্রান্ত প্রচারক তরুণ মুখোপাধ্যায় এবং সংস্কৃতভারতীর দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সম্পাদর সন্তু দত্ত। বর্গে অধিকারী হিসেবে ছিলেন ঘাটাল খড়ার বিদ্যালয়ের ইংরেজি ভাষার শিক্ষক অরুণ চক্রবর্তী। প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন সংস্কৃত শিক্ষক মধুসূদন জানা এবং অশোক মুখোপাধ্যায়। ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেন খড়্গপুর আইআইটি-র বিশিষ্ট অধ্যাপক ড. মহেশজী। শতাধিক শিক্ষার্থী এই প্রশিক্ষণ বর্গে অংশগ্রহণ করেন। এদের মধ্যে মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত ছাত্র-ছাত্রী এবং কয়েকজন সামাজিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। বর্গে সকলকেই সংস্কৃতভাষায় বার্তালাপ করতে হতো। ভোর পাঁচটা থেকে রাত্রি দশটা পর্যন্ত প্রশিক্ষণের বিভিন্ন কার্যক্রম চলত। সমাপন সত্রে বিশেষ অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন MAKAIAS - এর ড. অভিজিৎ সিংহ এবং বক্তা হিসেবে ছিলেন সংস্কৃতভারতীর পূর্বক্ষেত্রের সংগঠন সম্পাদক প্রণব নন্দ। অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা সংস্কৃতভাষায় নিজ নিজ অনুভব ব্যক্ত করেন।

পশ্চিমবঙ্গের ধান-সংস্কৃতির মিঠেল উৎসব

নবান্ন

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

কথায় আছে, 'নবীন ধান্যে হবে নবান্ন'। খনার বচনে আছে, 'বেদের কথা না হয় আন, তুলা বিনা না পাকে ধান।' 'বেদ' বা জ্ঞানের কথা হলো, শালিধান পাকলে হবে নবান্ন। 'তুলা' বা কার্তিক মাস না গেলে ধান পাকে না। নবান্নের আনুষ্ঠানিকতার সূত্রপাত তাই কার্তিক পেরিয়ে অঘ্রানের পয়লা।

কার্তিক সংক্রান্তিতে নবান্নের দেবতা 'নবানে কার্তিক'-এর পূজা আরাধনা হয়ে যায়। লোকসমাজে কার্তিক শস্যরক্ষার দেবতা। কাটোয়া মহকুমা, উত্তরবঙ্গের কোচবিহার প্রভৃতি অঞ্চলে শস্যরক্ষার দেবতা। মাঠে মাঠে সোনালি ফসল তখন ধান্যলক্ষ্মী হয়ে ভূমিলক্ষ্মীর পদতলে দিয়েছে ধরা। এবার 'আকবোল ধান' (যে ধান আগে থেকেই লক্ষ্মীপূজার জন্য নিবেদিত হবার জন্য ঘোষিত) 'মুঠ' করে গোছ সমেত কেটে গৃহে আনতে হবে। চাষির ভাষায় 'মুঠ আনা'। শ্রমজীবী মানুষের কাছে যেন ধরণীর 'উপহার'! গ্রামের গৃহস্থ পুরুষ এদিন মাথায় করে লক্ষ্মীকে ঘরে আনবেন।

গৃহস্থ তাই ভোরের স্নান সেরে নব বস্ত্র পরিধান করেছেন। হাতে কাস্তে, মাথায় গামছার উষ্ণীষ, কোমরেও গামছা, খালি পা। ঈশান কোণে গিয়ে তিনি আড়াই আলুই ধান কেটেছেন আড়াই প্যাঁচে, তা পরম যত্নে বেঁধেছেন, 'মাগো, তোমার কৃপা যেন জন্ম জন্মান্তরে পাই। সন্তানকে দুধে-ভাতে রাখার ভাত দিও মা। মাগো, অন্নলক্ষ্মী।' তার আগে কার্তিক অমাবস্যায় বাঁধনা পরবে গো-বন্দনা অনুষ্ঠানে গো-মাতার আশীর্বাদ নিয়েছেন চাষি, সন্তানের মুখে দুধের জোগান হোক। গোয়ালঘরে বকনা বাছুর আসুক।

'মুঠ-ধান' মাথায় নিয়ে গৃহে এসেছেন কৃষক। এ দেবতার আশিস। গৃহে লক্ষ্মীর আসন, উঠোনে গোলাঘরে শস্যরূপা দেবী। আজও কলাবউ সেজে উঠেছেন। আটনে-উঠোনে-মরাইয়ে আজ মাঙ্গলিক পূজা।

ময়মনসিংহগীতিকার কথা মনে হচ্ছে—

'পাঞ্চগাছি বাতার ডুগুল
হাতেতে লইয়া।
ধানের গাড়ি মাঠ থেকে ঘরমুখো
মাঠের মাঝে যায় বিনোদ
বারোমাস্যা গাহিয়া।।'

এইবেলা পয়লা অঘ্রান থেকে শুরু হলো ধান কাটার অনুষ্ঠান। এদিন থেকে কৃষকের ব্যস্ততা। নতুন ফসল উঠবে। একসময় 'অগ্রে' থাকা বাৎসরিক সময় মানেই 'অগ্রহায়ণ' বলে বিবেচ্য হতো। অঘ্রানেই শুরু হতো পঞ্জিকার গণনা। বছরও শুরু, ধানও গোলায় আসছে।

ধান তো শুধু আমাদের আহার নয়, ধান আমাদের লোকায়তিক সংস্কৃতির ভিত্তিভূমি। গোলায় ধান ভরে উঠলেই গলায় গান আসে! অর্থনীতির পুরোটাই তখন ধানকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতো। সে আমন ধান, সেটাই শালিধান্য। আষাঢ়ে শুরু, আর কার্তিকে শেষ। এরপর ধানকাটা সারা হলে মাঠ বিষণ্ণ বিধবা।

দিকে দিকে মুনিশের হাঁকডাক আর মেশিনের ঘর্ঘর শব্দ। ধান উঠে জমি ফাঁকা হবার অঘ্রান মাস এলো। সকাল থেকে সন্ধ্যে, মাঠের দেবতার সংস্পর্শে হাত পবিত্র হয়ে ওঠে কৃষি মজদুরের। মা লক্ষ্মী আশীর্বাদ করেন তাদেরও, শ্রমের বিনিময়ে আহারের সংস্থান হোক তাদের। তাই জুতো পায়ে জমিতে নয়, ভূমি স্পর্শ করে, মাথায় ঠেকিয়ে ভূমিকে ঢোকা। মোদের ধানই মোদের মান।

মুঠ-আনা ধানের গোছাই পূজা হবে নবান্নে। এরই মধ্যে ধান কাটা চলবে, মরাই পূর্ণ হবে, দেবী অন্নপূর্ণা কৃষকের বাস্তুতে অধিষ্ঠান করবেন। মা আর মেয়ে; দেবী দুর্গা আর দেবী লক্ষ্মীর যুগপৎ আশিস সঙ্গে নিয়েই নবান্ন খাওয়া হবে।

এই খাদ্যের জন্য বিশ্বের অজস্র যুদ্ধ, লড়াই, ছলনা-প্রতারণা। গরিব কৃষক সকলকে খুশি করে তবেই নিজের ধানটুকু রাখতে পেরেছে। নবান্নের পশ্চাতে তার সংগ্রামের এক দীর্ঘ অধ্যায়। নলপূজাতে মা-লক্ষ্মীর 'সাধ-ভক্ষণ' করিয়ে 'ধান ডেকে' যে আশার আলো আশ্বিন সংক্রান্তিতে দেখেছিলেন কৃষক, তাই আজ সোনালি সন্তানে বাস্তব হয়ে উঠেছে মুঠপূজায়। মুঠোর মধ্যে আজ ধান্যকন্যা। □

পূর্বভারতের অসীম সাহসী বীরযোদ্ধা
লাচিত বরফুকন

ওম প্রকাশ ঘোষ রায়

যে সব হিন্দু বীর যোদ্ধা বিদেশি আক্রমণকারীদের পর্যুদস্ত করে দেশমাতৃকাকে রক্ষা করেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অহোম রাজ্যের বীর সন্তান ‘লাচিত বরফুকন’।

ভারতবর্ষের অহোম রাজ্য ও কামরূপ ছিল প্রাচ্যের জ্যোতিষবিদ্যার নগরী। যার রাজধানী এখন গৌহাটি বা গুয়াহাটি নামে পরিচিত। অতীতে এই অঞ্চল তন্ত্রসাধনার কেন্দ্রস্থল ছিল। আর সাধনায় তন্ত্রমন্ত্রের ধারক ও বাহক। যে কারণে তদানীন্তন সময়ে দিল্লির মুসলমান শাসকরা কেউ বহুচেষ্টা করেও, তাদের বিশাল সেনাবাহিনী পাঠিয়েও কামরূপ তথা অসম দখল করে রাখতে পারেনি। তবে মুসলমান শাসকেরা অসম, ত্রিপুরা ছাড়া অন্যত্র যথেচ্ছ বর্বরতা চালিয়ে পদানত করলেও অসমের হিন্দু শাসকদের প্রবল প্রতিপত্তির ধারে কাছেও আসেনি।

এই অহোম রাজ্যের এক অসীম সাহসী হিন্দু বীর যোদ্ধা ছিলেন জেনারেল লাচিত বরফুকন। তিনি অসমে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৬২২ খ্রিস্টাব্দে নভেম্বর মাসের ২৪ তারিখে। তাঁর পিতা তামুলি বারবারুয়া ছিলেন একজন চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক। যাঁর বেতন ছিল মাত্র ৪ টাকা। তিনি পরবর্তী সময়ে অহোমের রাজা প্রতাপ সিংহের দব বাবে বিশিষ্ট মন্ত্রী হয়েছিলেন এবং অহোম রাজের প্রশাসনিক দপ্তরের সার্বিক উন্নতি ও প্রগতি সাধন করেন। তাঁরই প্রভাবে তাঁর ছোটো সন্তান লাচিত রাজা প্রতাপ সিংহের পাঁচ সদস্যের একজন কাউন্সিলার এবং বিচার বিভাগের এক্সিকিউটিভ ও জুডিসিয়াল বিভাগের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন। একসময় অহোম সেনাবাহিনীর কমান্ডার-ইন-চিফ হন। তারপর লাচিত রাজা চক্রধ্বজ সিংহ কর্তৃক ‘বরফুকন’ সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন। এমনিভাবে একদিন মোমাই তামুলির ছোটো ছেলে শুধুমাত্র অসমের ইতিহাস নয় অহোম সীমান্ত ও সংস্কৃতিতে নীতি নির্ধারণে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিলেন। ১৬১৫ খ্রিস্টাব্দে অহোম রাজ এবং মুঘল উভয় পক্ষ যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। প্রথমবার অসম দখলের যুদ্ধ সমাপ্ত হয়েছিল আবুবকর এবং ভুষণের রাজার মধ্যে যুদ্ধে মুঘলদের অবমাননাকর পরাজয়ের মধ্য দিয়ে। যে কারণে মোগলবাহিনী অসম দখলের জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছিল আরও সংগঠিত ও জোরালো ভাবে এগিয়ে আসার জন্যে।

ইতিমধ্যে উভয়পক্ষের মধ্যে বেশ কয়েকবার যুদ্ধ হয়েছিল। যাতে কিছু স্থান হাতবদল করেছিল। এবং রণক্লান্ত পরিস্থিতিতে এক চুক্তি সম্পাদনের মধ্য দিয়ে ঠিক হয় যে, অসমের পশ্চিমাংশ এবং গৌহাটি মুঘলদের হাতে থাকবে। অসমীয়রা বুঝতে পেরেছিল যে মোগলরা কামরূপ দখল করে অসমকে শাসন করবে। এমনি ভাবে ১৬৩৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৬৪৮-এর মধ্যবর্তী সময়ে অসমের শাসনকাল ছিল সংঘাতময় ও উত্তেজনাপূর্ণ। মূলত অসমের রাজা জয়ধ্বজ সিংহের মনে মুঘলদের শাসন সম্পর্কে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। অবশেষে সাহসের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে মুঘলদের পরাজিত করে ও তাড়িয়ে দেয়।

এই ঘটনাবলী দিল্লির বাদশা আওরঙ্গজেবের নিকট অজানা ছিল না। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে মীরজুমলাকে পুনরায় অসম আক্রমণ করতে নির্দেশ দিলেন। ১৬৬২ সালের ১৭ মার্চ মুঘলসেনা অসমের রাজধানী গুয়াহাটিতে প্রবেশ করে। রাজা জয়ধ্বজ ভয়ে পালিয়ে গিয়ে পাহাড়ে আশ্রয় নিলেন। যখন বর্ষাকাল এলো তখন মুঘলবাহিনী অতি বৃষ্টি ও বন্যায় কাতর হয়ে মনোবল হারিয়ে ফেলল। যে কারণে মীরজুমলা স্বাস্থ্যহানিতে ভুগে অসুস্থ হয়ে পড়ে। ডিসেম্বর মাসে অহোম রাজ শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন এবং পুনরায় রাজধানী দখল করেন। কিন্তু অপরপক্ষে মুঘল বাহিনী সেখানে পুনঃ যুদ্ধ করতে অনীহা

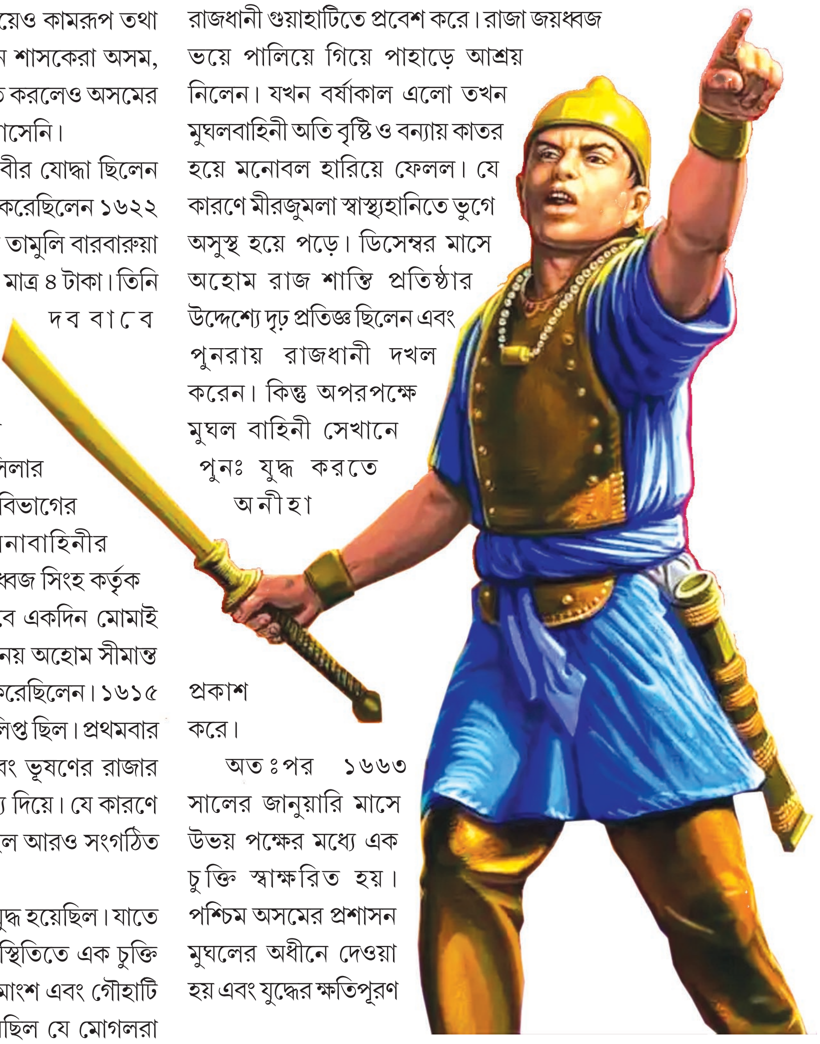

প্রকাশ করে।

অতঃপর ১৬৬৩ সালের জানুয়ারি মাসে উভয় পক্ষের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পশ্চিম অসমের প্রশাসন মুঘলের অধীনে দেওয়া হয় এবং যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ

বাবদ ৩ লক্ষ টাকা ও ৯০টি হাতি মুঘলদের প্রদান করা হবে বলেও জানানো হয়। কিন্তু এতসব কিছুই তাদের মনঃপূত হলো না, তাই অনন্যোপায় হয়ে রাজা তাঁর পুত্র ও কন্যা রামানী গাভারাওকে বাদশা আওরঙ্গজেবের কাছে সওগাত নিয়ে পাঠালেন। পরিণতিতে বাদশা রাজার মেয়েকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করে। রহমত ভানু বেগম নামান্তরিত হয়ে মুঘল হারেমে তাঁর ঠাঁই হলো। এই তো ছিল মুসলমানদের ইসলাম সম্প্রসারণের নীতি।

১৬৬৩ সালে যদিও চক্রধ্বজ সিংহ অসমের সিংহাসনে বসেন। কিন্তু মুঘলদের অবমাননার কথা ভুলতে পারেননি। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে, জরিমানা দেওয়া বন্ধ করে অসম থেকে অনুপ্রবেশকারী মুঘলদের তাড়িয়ে দেবেন। ১৬৬৭ সালের আগস্ট মাসে অহোম সেনাবাহিনী দুই মাসের মধ্যে পুনঃ আক্রমণ করে মুঘলদের শুধু তাড়িয়েই দিল না। তারা গুয়াহাটি দখল করে নব্য ফৌজদার সৈয়দ ফিরোজ খানকে বন্দি করে।

বাদশা আওরঙ্গজেব এই সংবাদ পেয়ে এক বিশাল সেনাবাহিনীকে অম্বররাজ রাজা জয় সিংহের পুত্র রাজারাম সিংহকে গৌহাটির প্রাক্তন ফৌজদার রসিদ খান-সহ পাঠালেন অসম দখল করতে। মুঘল বাহিনীর তুলনায় অহোম সেনারা ছিল অতি স্বল্প সংখ্যায় যা মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ার কথা নয়। কিন্তু তাদের ছিল অদম্য মনোবল এবং লাচিত বরফুকনের মতো বীরের নেতৃত্ব।

মুঘলরা বলেছিল তাদের দাবি ৩ লক্ষ টাকা এবং ১৬৩৯ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক সীমান্ত যা নির্ধারিত ছিল তা দিতে হবে। যদিও ১৬৩৯ খ্রিস্টাব্দে ১৬৭১ খ্রিস্টাব্দ অবধি উভয় পক্ষের মধ্যে কয়েকবার যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। কখনো জয় কখনো পরাজয় এভাবেই চলছিল। কিন্তু সরাইঘাটের বিখ্যাত যুদ্ধে অহোম বাহিনী জেনারেল লাচিত বরফুকনের নেতৃত্বে তাঁর সামর্থ্য দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণ করেছিলেন। অহোমরা চেয়েছিল বহিরাগতদের ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হোক। কিন্তু লাচিত বরফুকন বুঝেছিলেন যে তাঁর সেনাবাহিনী এমতাবস্থায় মুঘল বাহিনীর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবে না। তাই তিনি কালহরণ করে প্রত্যাঘাতের চিন্তা করে নিয়ে ঘুরে দাঁড়াবেন। এবং আরও বেশি সময় পেতে একটা সমঝোতায় আসার জন্যে রাজারাম সিংহের সঙ্গে তার বন্দি ফিরোজ খানকে দূত হিসেবে নিয়োগ করেন।

কেননা মুঘলদের উপর চাপ প্রয়োগ করে সমঝোতায় যেতে আগ্রহী হলে তাতে করে তিনি সীমান্ত দখলের জন্য দুর্গ নির্মাণ ও প্রাকার তৈরির জন্য কিছুটা সময় পেয়ে যাবেন। কিন্তু হঠাৎ করে তাঁর মনোভাব পরিবর্তন করে ফেলেন। 'নাঃ এক ইঞ্চি পরিমাণ মাতৃভূমির জমিও শত্রুপক্ষকে দেবেন না।' এই উক্তি করলেন তখন যে সময় ব্রহ্মপুত্রের উপর বাঁধ তৈরি করা হচ্ছিল। কিন্তু তিনি দেখলেন যে কাজের নমুনা অতি সন্তোষজনক নয়। কীভাবে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আরও মজবুত করা যায় তাই ভাবছিলেন। এমনকী তাঁর নিজের কাকাকে বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তিস্বরূপ হত্যা করেছিলেন। এবং গর্বে বলেছিলেন, 'দেশের চাইতে আমার কাকা কখনো বড় হতে পারে না।' বলা বাহুল্য যে এই স্বল্প সময়ের মধ্যে তাঁর সামরিক রক্ষণভাগ তৈরি হয়ে গিয়েছিল।

সরাইঘাটের কাছে ব্রহ্মপুত্র ছিল অপ্রশস্ত নদী বিশেষ। আর অহোম বাহিনীর কাছে এই অংশটাই ছিল নৌ প্রতিবন্ধকতার জন্য আদর্শ স্থান। লাচিত এই স্থানটিকে ব্যবহার করে শত্রুসৈন্যের গতিবিধি দেখতে স্থলপথ হয়ে যাতায়াতের জন্য আক্রমণ করতে লক্ষ স্থির করার সুবিধা হবে বলে মনে করেছেন। তিনি তাঁর বাহিনীকে নদীর দক্ষিণ পাড় থেকে নির্দেশ দিচ্ছিলেন।

এমন সময়ে মুঘল নৌবাহিনী ও স্থল বাহিনী এসে পৌঁছাল। যখন মূল যুদ্ধ শুরু হবার পথে দুর্ভাগ্যজনকভাবে লাচিত অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী হন। শেষ অবধি ১৬৭১ সালের মার্চ মাসে রাজারাম সিংহ গৌহাটি অভিমুখে যাত্রা করেন। মুঘল বাহিনী সেই সুযোগে নৌপ্রতিবন্ধকতা ভেঙে ফেলে সরাইঘাটের উত্তর দিকে অগ্রসর হতে থাকে। আর অহোম স্থলবাহিনী ভয় পেয়ে পালাতে শুরু করে। লাচিত কিন্তু শয্যাশায়ী অবস্থায় ও তাঁর দুর্গ ইটাখুলী থেকে লক্ষ্য রাখছিলেন। এবং সেখান থেকেই তাঁর বাহিনীর ৬টা রণতরীকে সরাসরি মুঘল যুদ্ধ জাহাজকে আক্রমণ করার নির্দেশ দেন। যদিও তিনি মারাত্মক অসুস্থ অবস্থায় ছিলেন তথাপিও তাঁর নেতৃত্বে এবং যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবস্থান থেকে অহোম সৈনিকদের যুদ্ধে সক্রিয় অংশ নিতে তাদের মনোবল ফিরিয়ে আনেন। শীঘ্রই তাঁর ৬টি রণতরী ও স্থলবাহিনীকে আক্রমণ চালিয়ে শত্রু সেনাদের হত্যা করতে থাকে। অর এমনি একসময় মুঘল নৌসেনাধ্যক্ষ মুনাওয়ার খান হুক্কা আক্রমণরত অবস্থায় নিহত হয়। এটাই ছিল মুঘল বাহিনীর শেষ চেষ্টা। লাচিত তাঁর বাহিনীকে দিয়ে পালটা আক্রমণাত্মক কৌশল চালিয়ে গেলেন যতক্ষণ পর্যন্ত না অহোম সেনাবাহিনী পশ্চিম সীমানায় পৌঁছতে সক্ষম হয়। অতঃপর পশ্চিম সীমান্তে পৌঁছে গেলে তিনি তাঁর বাহিনীকে আদেশ দেন যে, আর অগ্রসর না হয়ে পলায়নরত শত্রু সৈন্যদের হত্যা করতে।

একসময় ১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মুঘল কর্তৃক গৌহাটি দখল করে নিয়েছিল। কিন্তু তারা প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতার সাহায্যে ১৬৭২ সাল পর্যন্ত গৌহাটির কর্তৃক দখল করে রেখেছিল। যখন গৌহাটি অহোম সেনাবাহিনী কর্তৃক পুনর্দখল হয়েছিল তারপর থেকে আর কখনো মুসলমানরা অসম আক্রমণ করার সাহস দেখায়নি।

বীর লাচিত বরফুকন সরাইঘাট যুদ্ধের এক বছর পর অসুস্থ অবস্থায় পরলোকগমন করেন। তাঁর দৃঢ় মনোবল এবং কর্তৃত্বমূলক, আক্রমণাত্মক মনোভাবের কারণে অসমের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মুঘল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সক্রিয় অবস্থানে থাকে, যা ছিল অসম রাজত্ব ও অসমের রক্ষার মূল চাবিকাঠি। অসমের অনেক প্রবীণ এবং সমসাময়িক ইতিহাসবেত্তা কিছু ব্যক্তির বিশ্বাস ছিল যে যদি অহোম সেনাবাহিনী লাচিতের নেতৃত্ব না পেত তবে মুঘল রাজত্ব সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারত এমনকী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করত।

লাচিত বরফুকন এমন একজন সামরিক জেনারেল ছিলেন যিনি তাঁর নিজস্ব যুদ্ধের কলাকৌশল দ্বারা অসমের ইতিহাসকে পরিবর্তন করার মতো ব্যক্তিত্ব ও বীরত্ব প্রয়োগ করে ভারতবর্ষের মহান বীর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

আজ এই স্বাধীন হিন্দুস্থানের গৌরবময় ইতিহাস রচনার সময় হয়েছে। বীর লাচিত বরফুকন-সহ আমাদের অতীতের জানা অজানা সকল হিন্দু বীর যোদ্ধাদের সত্যিকারের বীরত্বের ধারক বাহক হিসেবে নব প্রজন্মের জন্য বিস্তারিত ভাবে পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করে জাতীয় স্তরে তাঁদের সম্মান প্রদর্শন করা বর্তমানে জাতির অবশ্য কর্তব্য।

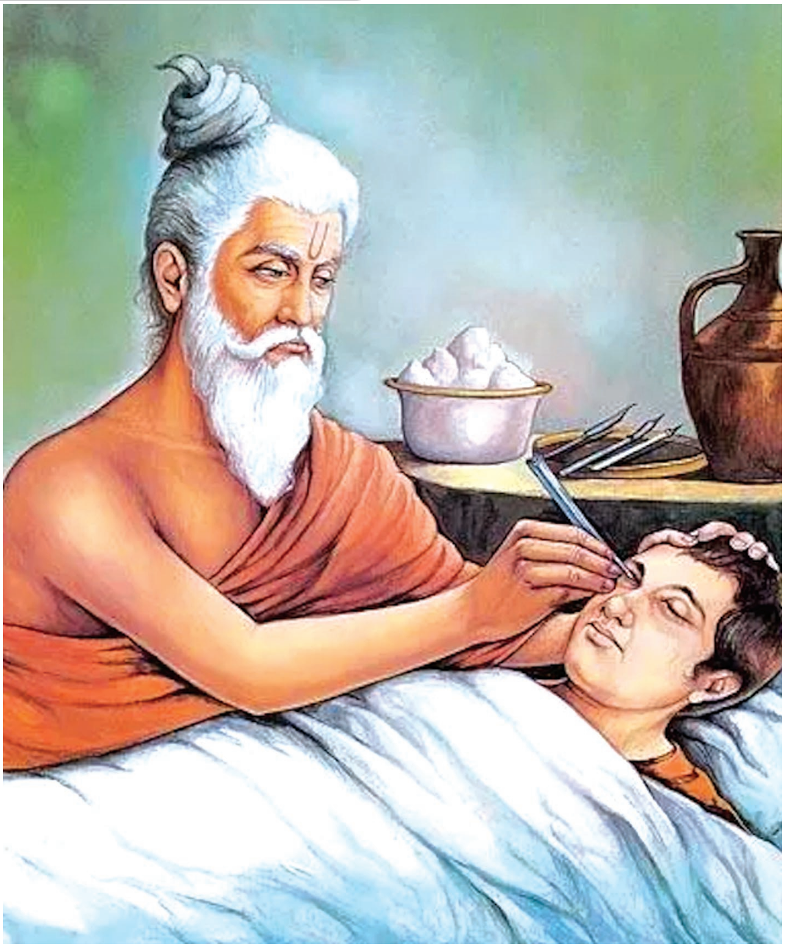

ভারতীয় অস্ত্রোপচারের জনক মহর্ষি সুশ্রুত

দীপক খাঁ

তখন প্রায় মধ্যরাত, হঠাৎ দরজায় টোকা পড়তেই ঘুম ভেঙে গেল। দরজা খুলতেই দেখলেন একজন আগন্তুক এক পর্যটক দাঁড়িয়ে আছে। সে কাতর স্বরে জানাল— আমাকে বাঁচান। তাঁর মুখ রক্তে ভেসে যাচ্ছে। ঋষি তাঁকে স্বস্নেহে বসতে বললেন এবং ঠিক হয়ে যাওয়ার কথাও বললেন। পথিককে পোশাক ছাড়িয়ে রক্তাক্ত মুখে প্রথমে জল দিয়ে ও পরে গাছগাছালি থেকে প্রস্তুত তেল দিয়ে ধুয়ে দিলেন। পরিষ্কার করে দেখলেন নাকের সামনের দিকে বেশ কিছুটা অংশে মাংস নেই।

তখন বাগান থেকে গাছের পাতা নিয়ে এসে প্রথমে ক্ষতস্থানের মাপ করে পাতা কেটে ফেললেন এবং পথিককে পান করার জন্যে পাত্রে সুরা দিলেন। সুরাপান করে পথিক যখন প্রায় অবচেতন হয়ে পড়ল তখন তার গাল থেকে কাটা পাতার মাপ করে বেশ কিছুটা মাংস কেটে, নাকের মধ্যে সাবধানে দুটি নল ঢুকিয়ে, কাটা মাংসকে তার ওপর সযত্নে রেখে, বিশেষ গাছের শিকড়ের গুঁড়ো, রক্তচন্দন ও এক প্রকার ফলের রস ছড়িয়ে দিলেন। তারপর তুলো ও শোধিত তিসির তেল দিয়ে ভালো করে পট্টি বেঁধে দিলেন। কাটা গালটিতেও ভালো করে পট্টি বেঁধে দিলেন। সকালে পথিকের চেতনা ফিরলে তাকে বললেন সব ঠিক হয়ে যাবে। বেশ কিছুদিন তাকে কী কী করতে হবে আর কী কী করবে না তাও বলে দিলেন এবং গাছ-গাছালি থেকে প্রস্তুত কিছু ওষুধ দিলেন। কয়েক সপ্তাহ পরে ক্ষতস্থান পরীক্ষার জন্য পথিককে আবার আসতে বলে দিলেন। ঘটনাটি আজ থেকে প্রায় তিন হাজার বছর আগেকার। এই ভারতীয় চিকিৎসকের নাম মহর্ষি সুশ্রুত।

মহাভারত অনুযায়ী কথিত যে, ঋষি বিশ্বামিত্রের পুত্র ছিলেন সুশ্রুত। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে তিনি জন্মেছিলেন বলে ধারণা করা হয়। অনেকের মতে তিনি প্রথম শতক থেকে দশম শতকের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বারাণসীতে কাশীরাজ দিবোদাস ধন্বন্তরির আশ্রমে ওষুধ ও চিকিৎসা বিষয়ক শিক্ষা অর্জন করেন। সুশ্রুত বিষয়ে যা জানা যায় তা হলো। 'সুশ্রুত সংহিতা', প্রাচীন ভারতের চিকিৎসা বিষয়ক একটি উল্লেখযোগ্য সংস্কৃত পুস্তক। পুস্তকে ১১২০ প্রকারের রোগের কথা উল্লেখ আছে ১৮৪টি অধ্যায়ের মধ্যে। ৭০০ প্রকার ভেষজ উদ্ভিদ, ৬৪ প্রকার খনিজ মৌলজাত ওষুধ এবং ৫৭ প্রকার প্রাণিজ ওষুধের তথ্য পাওয়া যায়। তিনি প্রথমে নাকের প্লাস্টিক সার্জারি করেন। তিনিই প্রথম 'সিজারিয়ান' অস্ত্রচিকিৎসার বিধান দিয়েছিলেন। শল্যচিকিৎসার সাহায্যে শুক্রাশয়ের পাথর নির্গমন করার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। ভাঙা হাড়ের চিকিৎসা পদ্ধতি এবং চোখের ছানি বার করায় তিনি সুদক্ষ ছিলেন।

সার্জারির আগে রোগীকে সুরা পান করে কিছুটা ব্যথার অনুভূতি থেকে রেহাই পাওয়ার ব্যবস্থার কথা জানিয়ে ছিলেন, যার ফলে তাঁকে আধুনিক অবশ ক্রিয়ার জনক বলা হয়। শল্যচিকিৎসা করার আগে সরঞ্জামগুলিকে আগুনে পুড়িয়ে জীবাণুনাশক করার কথা উল্লেখ করেছিলেন। তাঁর গ্রন্থে ১০১টি উপকরণের কথা উল্লেখ আছে। পশুপাখির আকৃতির সঙ্গে মিল দেখে পশুপাখির নামের সঙ্গে জড়িয়ে অস্ত্রচিকিৎসার উপকরণগুলির নামকরণ করার পদ্ধতি তিনি চালু করেন

ভারতীয় নারী
অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

দেবযানী ভট্টাচার্য

আগামী ২০৪৭ সালের মধ্যে 'উন্নয়নশীল দেশ' থেকে 'উন্নত দেশ' এর স্তরে উন্নীত হওয়ার লক্ষ্য স্থির করেছে ভারতবর্ষ। স্বাধীনতা-উত্তর কাল থেকে এক দশক আগে পর্যন্ত সময়ের যাত্রাপথে ভারতবর্ষ না পেরেছে তার নারীরত্নদের উপযুক্ত মান দিতে, না পেরেছে ভারতের প্রগতিতে দেশের নারী সম্পদের অপরিসীম সম্ভাবনার সদ্ব্যবহার করতে। যে আদর্শ নিয়ে ভারতীয় নারী সমাজের গঠনে স্বামী বিবেকানন্দ এনেছিলেন ভগিনী নিবেদিতাকে, ঔপনিবেশিক শাসনোত্তর ভারতবর্ষে সে আদর্শের বাস্তবায়ন হয়নি। ফলে সমাজসত্তার সামগ্রিক স্বমহিমায় ফিরতে ভারতীয় নারী পারেনি। অতঃপর ঔপনিবেশিকতার গ্লানিযুক্ত হয়ে স্ব-বোধ ফিরে পাওয়ার আগেই ভারতীয় সমাজের হয়ে গিয়েছে এমন পরিবর্তন যার মাধ্যমে সমাজবোধ ও জীবন দর্শনের মাঝে বিস্রস্তভাবে ঢুকে পড়েছে সহস্র প্রকারের পরস্পরবিরোধী আবেগ, আচরণ, চিন্তন ও শিক্ষণের এক অদ্ভুত মিশেল, ভারতীয় নারীকে (পুরুষকেও) যা টেনে নিয়ে ফেলেছে তার নিজসত্তা থেকে বহু দূরে।

স্বাধীনতা-উত্তর কালের প্রবল ঝড়ো হাওয়ায় এই সময়ে আত্মবিস্মৃতির আবর্তে ঘুরপাক খেতে খেতে নিজেকে চেনার ক্ষমতাই বুঝি-বা লোপ পেতে বসেছে ভারতীয় নারীর! অথচ এদেশের নারী যদি গড়ে উঠত ভগিনী নিবেদিতার মতো, যদি হয়ে উঠত স্ব-বোধসম্পন্ন ও উপযুক্ত, উন্নত দেশ হয়ে ওঠা সেক্ষেত্রে ভারতবর্ষের মতো প্রাচীন সভ্যতার পক্ষে এমনকী আর দুরূহ ছিল?

এখন প্রশ্ন হলো, স্ব-বোধের পুনর্জাগরণ ব্যতীত ভারতীয় নারীর স্ব-মহিমার ঔজ্জ্বল্য কি ফিরবে? বিস্মৃত হওয়া কি চলে যে অতীতে ভারতীয় নারী একদা ছিল অনায়াসচারিণী? চৌষট্টি কলায় (অর্থাৎ নানাপ্রকার বিজ্ঞান ও কলা বিদ্যায়) পারঙ্গমা হয়ে ওঠার পূর্ণ স্বাধীনতা সেকালে তার ছিল, সমাজ তার জন্য বাধা নয়, ছিল সহায়ক, সেই সঙ্গে পোশাকআশাকেও ছিল নারীর স্বেচ্ছাধীন স্বাচ্ছন্দ্য— আজকের দিনে এসব নেই বলেই দেশের গৌরবময় অতীতকে বিস্মৃত হওয়া কি উচিত হয়?

যে দেশের নারীর পোশাকে একদা ছিল দেশের আবহাওয়ার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণস, খোলামেলা, সেলাইবিহীন বস্ত্রখণ্ডের বিবিধ বিন্যাস, যে বিন্যাসে বক্ষবন্ধনী তথা কাঁচুলির ব্যবহার ছিল কেবলইমাত্র

স্মরণ করা আবশ্যক। কী প্রকার নারীসমাজ গঠনের দায়িত্ব ভগিনী নিবেদিতাকে দিয়েছিলেন স্বামীজী। পুনরোপলব্ধি করতে হবে যে সমাজে সর্বপ্রকার বিদ্যা ও শক্তির আবাহনে মাতৃশক্তির পুনর্জাগরণ অপরিহার্য। এহেন লক্ষ্যের সাধনে ভারতীয় নারীকে যেমন নিজেদেরকে নিবেদন করতে হবে স্ব-বোধজাগরণের মহাযজ্ঞে, ভারত দেশকেও তেমনই উৎসুক নয়নে চাইতে হবে তার নারীর মুখপানে।

ফঃ ৫

ঐচ্ছিক, সে দেশের নারী যদি আজ উন্মুক্তপৃষ্ঠ ব্লাউজ পরে, শাড়ির আঁচলে বক্ষযুগলের বিভাজিকা আবৃত না করার মধ্যেই তথাকথিত 'বিপ্লব'-এর স্বাদ পায়, অথবা অঙ্গ ঢাকে আপাদমস্তক আলখাল্লায়, তাহলে যে সে তার প্রকৃত স্বাধীনতার সুপ্রাচীন ঐতিহ্যটিকে নিশ্চিত ভুলেছে সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নেই। প্রশ্ন করতেও সে ভুলেছে যে আদৌ ব্লাউজ পরার বাধ্যবাধকতাটিই-বা তার কীসের?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তাঁর 'সেকাল' কবিতায় লিখেছেন—

'কুরুবকের পরত চূড়া কালো কেশের মাঝে,
লীলাকমল রইত হাতে কী জানি কোন কাজে।
অলক সাজত কুন্দফুলে, শিরীষ পরত কর্ণমূলে,
মেখলাতে দুলিয়ে দিত নবনীপের মালা।
ধারাযন্ত্রে স্নানের শেষে ধূপের ধোওয়া দিত কেশে,
লোধ্রফুলের শুভ্র রেণু মাখত মুখে বালা।
কালাগুরুর গুরু গন্ধ লেগে থাকত সাজে,
কুরুবকের পরত মালা কালো কেশের মাঝে।।
কুঙ্কুমেরই পত্রলেখায় বক্ষ রইত ঢাকা,
আঁচলখানির প্রান্তটিতে হংসমিথুন আঁকা।'

এ সেই ভারতবর্ষ যেখানে নারী তার বক্ষযুগলকে সাজাতো চন্দন ও কুঙ্কুমের অস্থায়ী ট্যাটু (পত্রলেখা) দিয়ে, কারণ বক্ষ আবৃত করার বাধ্যবাধকতা ছিল না। পুরুষের মন ও দৃষ্টিতেও ছিল সৃষ্টিশীলা প্রকৃতির সৌন্দর্যের প্রতি হৃদয়জ মুগ্ধতার দৃষ্টি। প্রেমের আবেশ, কামনার উচ্ছ্বাসে নারী-পুরুষের প্রেমজ মিলন ছিল সৃষ্টিধর্মী, ক্লেদবিহীন ও স্বেচ্ছাধীন, অথচ মর্যাদাপূর্ণ। এমনকী লোলুপ, লালসার মধ্যেও নারীসত্তার প্রতি ছিল না কোনো অসম্মান। সে ভারতবর্ষ দেহমূলকও ছিল না, আবার দেহবিবর্জিতও নয়। সমাজনির্দিষ্ট আচরণ ও মর্যাদাবিধি মেনে চলার বিষয়টিও ছিল নারী পুরুষ সকলের জন্যই নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মতো স্বাভাবিক। ফলে স্বাধীনতা ছিল প্রশ্নাতীত। অথচ আজকের যৌবনমদমত্তা ভারতীয় নারী যখন বাউলে হচ্ছেন নিজ অঙ্গপ্রদর্শনের খেয়ালে, তখন তিনি বিস্মৃত হচ্ছেন যে অনায়াসচারিণী হওয়ার স্বাধীনতা আজকের ভারতবর্ষ তাঁর আর নেই 'সেকাল'-এর ভারতবর্ষে যা তাঁর ছিল। অনায়াসচারিণী হওয়ার স্বাধীনতা বিনে যে স্বৈরিণী হওয়ায়ও 'সুখ' নেই, আত্মবিস্মৃত ভারতীয় নারী আজ তা ভুলেছে। সে দেশ, সে মন, সে ভাব, সে দৃষ্টি আজ আর নেই। আজকের ভারতবর্ষে নারী অঙ্গের প্রদর্শনে তাই মুক্তি নয়, আছে যৌনপ্রতিমা হওয়ার দৈহিক বন্ধন। অথচ আজকের ভারতীয় সমাজ কি তা সম্যক উপলব্ধি করে? নারীর দেহসুষমা জীবনরসে পরিপূর্ণ সৃষ্টিসৌন্দর্যের অমৃতভাণ্ড আজ আর নয়। বরং আজ তা যুদ্ধক্ষেত্র। দেহকে এহেন যুদ্ধক্ষেত্র হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করতে হলে যে সচেতন জাগরণের প্রয়োজন, সেইপ্রকার নারীজাগরণের মধ্যেই আছে ভারতীয় নারীর বন্ধনমুক্তির চাবিকাঠি এবং আছে ভারতবর্ষের 'উন্নত দেশ'-এ উন্নীত হয়ে ওঠার প্রকৃত দিকদর্শনও।

আজকের ভারতীয় নারীর রোল মডেল হবেন কে? প্রাচীন ভারতের নারীরত্নদের উদাহরণ কি একালের নারীর মধ্যে প্রতিস্থাপনযোগ্য? 'হে ভারত, ভুলিও না, তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী'— উত্তর-আধুনিক ভারতীয় নারী কী স্বামীজীর এই বাণীকে অন্তরে গ্রহণ করবেন? কিন্তু উত্তরাধুনিক তথা উত্তর- সত্য যুগ বলেই এ বাণীর প্রতি আধুনিক দৃষ্টিপাতও অপরিহার্য। মহাভারতকে ভারতবর্ষের ইতিহাস বলে গণ্য করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও। এহেন ঐতিহাসিক মহাকাব্যের এক নারীচরিত্র দেবী সাবিত্রীকে কি একখানি কেস স্টাডি হিসেবে ধরা যেতে পারে? রাজা অশ্বপতি বহু পুত্রের কামনায় আঠারো বছর যাবৎ সূর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সাবিত্রীর তপস্যা ও যজ্ঞ করার পর দেবীর বরে তাঁর এক কন্যার জন্ম হয়। সাবিত্রী। যথাকালে দেবী সাবিত্রী এমনই রূপবতী ও সূর্যের ন্যায় তেজস্বিনী এক কন্যা হিসেবে যৌবনপ্রাপ্ত হন যে তাঁর উপযুক্ত পাত্র পাওয়া হয়ে পড়ে দুষ্কর। পিতা অশ্বপতি তখন কন্যাকেই বলেন, নিজ উপযুক্ত বরের সন্ধান করতে। দেবী সাবিত্রী পতিত্বে বরণ করেন সত্যবানকে যিনি ছিলেন শাম্বরাজ দ্যুমৎসেনের পুত্র। সত্যবানের শিশুকালে দ্যুমৎসেন অন্ধ হয়ে যাওয়ায় শত্রুরা রাজা দ্যুমৎসেনের রাজ্য হরণ করে এবং রাজ্যহারা দ্যুমৎসেন সপরিবারে বরণ করেন বনবাসী জীবন। সত্যবানকে পতিত্বে বরণ করার পর দেবর্ষি নারদের কাছ থেকে সাবিত্রী জানতে পারেন যে সর্বগুণসম্পন্ন সত্যবানের মৃত্যু এক বছরের মধ্যে নিশ্চিত। দেবর্ষি নারদ দেবী সাবিত্রীকে বলেন পুনরায় অন্য কাউকে পতি নির্বাচন করতে। উত্তরে সাবিত্রী বলেন,

'সকৃদংশো নিপততি সকৃৎ কন্যা প্রদীয়তে।
সকৃদাহ দদানীতি ত্রীণ্যেতানি সতাং সকৃৎ।।

পামেলা পওল

দীর্ঘায়ুরথবাল্পায়ুঃ সগুণ্যে নির্গুণোঽপি বা।
সচ্ছদ্বৃতো ময়া ভর্তা ন দ্বিতীয়ং বৃণোম্যহম্।
মনসা নিশ্চয়ং কৃত্বা ততো বাচাভিধীয়তে।
ক্রিয়তে কর্মণা পশ্চাৎ প্রমাণং মেঁ মনস্ততঃ।।'

অর্থাৎ 'পৈতৃক ধনের অংশ একবারই প্রাপ্য হয়, কন্যাদান একবারই হয়, বচন একবারই দেওয়া হয়; এই তিন কার্যই এক-একবার মাত্র হয়। দীর্ঘায়ু বা অল্পায়ু, গুণবান বা গুণহীন, আমি একবারই পতিবরণ করেছি, দ্বিতীয় কাকেও বরণ করব না। লোকে আগে মনে মনে কর্তব্য স্থির করে, তারপর বাক্যে প্রকাশ করে, তারপর কার্য করে; আমি মনে মনে পতি বরণ করেছি, বিবাহের তাই প্রমাণ।'

অতঃপর সত্যবানের সঙ্গে হয় তাঁর বিবাহ। বিবাহের পর সত্যবানের মৃত্যুর চার দিন আগে থেকেই কঠোর তপশ্চর্যা আরম্ভ করেন সাবিত্রী। সত্যবানের মৃত্যু যেদিন হওয়ার কথা, ত্রিরাত্র উপবাসের পর সেই দিন স্বামী সত্যবানের সঙ্গে কাষ্ঠাদি সংগ্রহার্থে বনগমন করেন সাবিত্রী এবং সেখানেই হঠাৎ মৃত্যু হয় সত্যবানের। অতঃপর দীর্ঘকায়, কৃষ্ণবর্ণ, রক্তচক্ষু, মহাভয়ংকর যম এসে পাশে দাঁড়ানোর পর দেবী সাবিত্রী তাঁকে প্রশ্ন করেন 'কে আপনি? কী অভিপ্রায়?' যম তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিয়ে সত্যবানের সূক্ষ্ম দেহ নিয়ে চলে যেতে থাকেন আর সাবিত্রী করেন তাঁর অনুগমন। দেবী সাবিত্রীকে ফিরে যেতে বলায় মহাবিদুষী সাবিত্রী এমন সব গূঢ় তর্ক উত্থাপন করে যমের অনুগমন করতে থাকেন যে দেবীর সঙ্গে বাক্যালাপে জড়িয়ে পড়ে তাঁর কথায় মুগ্ধ হয়ে একটার পর একটা বর তাঁকে প্রদান করতে শুরু করেন যমরাজ। প্রতিটি বর দানের পর যম সাবিত্রীকে ফিরে যেতে বলেন, কারণ জীবিত সাবিত্রীকে যমলোকে নিয়ে যাওয়ার উপায় তাঁর ছিল না। কিন্তু বিদুষী সাবিত্রীও অকাট্য সব পালটা যুক্তি সাজিয়ে যমকে অনুসরণ করতেই থাকেন। একের পর এক বর প্রাপ্ত হয়ে দেবী সাবিত্রী ফিরে পান তাঁর শ্বশুরমশাই রাজা দ্যুমৎসেনের চোখের দৃষ্টি ও হৃত রাজ্য। অতঃপর নিজের জন্য প্রার্থনা করেন সত্যবানের ঔরসে বলবীর্যশালী শতেক পুত্রের জননী হওয়ার বর এবং প্রাপ্ত হন। এবার যম মরিয়া হয়ে ওঠেন দেবী সাবিত্রীর তর্কালাপ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য। কিন্তু শতপুত্রের জননী হওয়ার বরদানের সাফল্যার্থেই সাবিত্রী প্রার্থনা করেন স্বামী সত্যবানের জীবন। নিজের আশীর্বাদের মান রক্ষার্থেই যমরাজ বাধ্য হন সত্যবানের জীবন ফিরিয়ে দিতে। অর্থাৎ স্বয়ং ধর্মরাজের সঙ্গে ধর্মালোচনায় প্রবৃত্ত হয়ে দেবী সাবিত্রী রাজা দ্যুমৎসেনকে ফিরিয়ে দিলেন তাঁর দৃষ্টি, রাজত্ব ও পুত্রের প্রাণ পর্যন্ত এবং সেই সঙ্গে পেলেন শতপুত্রলাভের আশীর্বাদ। সাবিত্রীর পুণ্যে সাবিত্রীর পিতা রাজা অশ্বপতিও পত্নী মালতীর গর্ভে লাভ করেন শত পুত্র।

পুত্রসন্তান লাভ যে পরম আশীর্বাদ, ভারতীয় মহাকাব্যে রয়েছে তার অসংখ্য প্রামাণ্য কাহিনি। মহা তেজস্বিনী, অতিদক্ষ ও অনন্যসাধারণ এক বিদুষী কন্যা যে একাই বহু সন্তানের সমান হতে পারেন এবং পরিবার ও সমাজের জন্য হতে পারেন মহা সৌভাগ্যের প্রতিমূর্তি, মহাভারতে দেবী সাবিত্রীর উপাখ্যান তারই ব্যাখ্যান। অথচ সত্যবানের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সাবিত্রী যদি শোকবিহ্বল হয়ে যমের পায়ে লুটিয়ে পড়তেন, সেক্ষেত্রে নিশ্চিত সফল হতেন না।

আজ, তার অর্ধশতাব্দীরও অধিককাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর তাঁরা উপলব্ধি করতে শুরু করেছেন যে নারীত্ব অস্বীকার করার নয়, বরং পরম প্রাপ্তি ও মহা সৌভাগ্যের বিষয়। তাঁরা আরও উপলব্ধি করছেন যে 'পুরুষ' হয়ে ওঠার প্রচেষ্টায় নয়, বরং নারীত্বের অপরিসীম শক্তির পূর্ণ প্রকাশ ঘটে মাতৃশক্তির আধারে।

আধুনিক ভারতীয় নারী কি দেবী সাবিত্রীকে আইডল হিসেবে গ্রহণ করবে? করলে অতি দৃঢ় সমকালীন নারীচরিত্র গঠন সম্ভব যার দ্বারা নারী ও তার পরিবারের অপরিসীম অর্থনৈতিক ও সামাজিক শ্রীবৃদ্ধিও সম্ভব। অর্থাৎ সেক্ষেত্রে ভারতের গ্রস ডোমেস্টিক প্রডাক্টেও ভারতীয় নারী রাখতে পারবে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান আর সেই সঙ্গে সঙ্গে সম্ভব হবে নারী সুরক্ষা ও উপযুক্ত সমাজগঠনও। স্বাধীনতা উত্তরকালে যে প্রকার বিপদের সম্মুখীন হয়ে চলেছে ভারতীয় নারী তথা সমাজ, দেবী সাবিত্রীর মতো বিদ্যা, বুদ্ধি ও চরিত্রবল যে তা থেকে রক্ষা পেতে অত্যুপযোগী হতে পারবে, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র

নেই। হয়তো-বা এই হেতুই মহাঋষি মনু বলেছেন,

'প্রজানার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ।
স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন।।'

অর্থাৎ নারী স্বয়ং সৌভাগ্য, শ্রী, সমৃদ্ধি ও সৃষ্টি এবং সেই হেতু গৃহের দীপের মতো পূজ্যা। অর্থাৎ মহাঋষি মনুর বক্তব্য অনুসারে নারী বিনে জগৎ অন্ধকার। কিন্তু প্রশ্ন, আজকের সাধারণ ভারতীয় নারীর পক্ষে কি গৃহ, সংসার, সমাজ ও কর্মক্ষেত্রের মহাবিপদে স্থিতপ্রজ্ঞা, বিদ্যা, বুদ্ধি ও মেধার পরিশীলিত ও উপযুক্ত প্রয়োগে, স্থির মস্তিষ্কে, ধাপে ধাপে বিপদ-নিবারণের প্রয়াসে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে অগ্রসর হওয়া সম্ভব? নাকি বিপদে স্থিতপ্রজ্ঞ থাকার শিক্ষা আজকের অধিকাংশ সাধারণ নারীর (এমনকী পুরুষেরও) নেই?

আধুনিক ভারতীয় নারীর এক শহুরে অংশ অবশ্য মাতৃত্বের আশীর্বাদ আজ আর প্রার্থনা করেন না বরং মাতৃত্বকে জ্ঞান করেন আপন দুর্বলতা হিসেবে। বিদ্যা, বুদ্ধি ও যোগ্যতা অর্জনমাত্রই 'নারী' যদি আপনাকে 'নর' বা 'পুরুষ' জ্ঞান করতে শুরু করেন, তবে তদধিক অবমাননা নারীর বুঝি আর হয় না। স্ব-বোধের পুনর্জাগরণ হলে এমন আত্মাবমাননায় প্রবৃত্ত হওয়া ভারতীয় নারীর পক্ষে অসম্ভব হবে। উপরন্তু, জীববিজ্ঞানের নিয়মানুসারে মাতৃত্বই নারীজীবনের জীবধর্মীয় উদ্দেশ্য হওয়া সত্ত্বেও এই বৈজ্ঞানিক সত্য আধুনিক ভারতীয় নারীর কাছে অনেকাংশেই আজ আর গ্রহণযোগ্য নয়। অথচ প্রজননের মতো মৌলিক জীবধর্ম এবং তৎপরবর্তী মাতৃধর্ম পালনেই যদি দেখা দেয় অনীহা, তবে একদিকে যেমন দেশ ও সমাজের প্রতি আপন কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হবে নারী, অন্যদিকে দেশ ও সমাজও তেমনই হয়ে পড়বে শ্রীহীন ও যান্ত্রিক, ভারত সভ্যতার সমাজধারার সঙ্গে যা একেবারেই সাযুজ্যপূর্ণ নয়।

পাশ্চাত্যের নারীরা বরং তাঁদের সমাজে নারীবিদ্বেষের প্রকৃত ও তীব্র উপস্থিতি সত্ত্বেও নারীত্বের মহিমার সম্যক উপলব্ধি বর্তমানে ধীরে ধীরে প্রাপ্ত হচ্ছেন। শুধুমাত্র পেশাগত ক্ষেত্রে সফল হয়ে 'পুরুষ' হয়ে ওঠার প্রচেষ্টার মধ্যেই সাফল্য বুঝি-বা তাঁরা আর দেখছেন না। এ বিষয়ে উল্লেখ করা যায় চাই ২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে 'দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস' পত্রিকায় আমেরিকার লেখিকা, সাংবাদিক, সম্পাদক ও স্তম্ভলেখক পামেলা পওলের 'আ মেসেজ ফর গার্লস অ্যাবাউট ওম্যানহুড' শীর্ষক একটি লেখার কিছু অংশ। পামেলা লিখেছেন, '...শিক্ষা ও কেরিয়ারগতভাবে আমেরিকার মেয়েরা এই মুহূর্তে বিপরীত লিঙ্গের মানুষদের চাইতে ভালো করছে। গত পঞ্চাশ বছরে আইনগত ও সামাজিক অগ্রগতির ফলে বর্তমান কালখণ্ডটিকে আমেরিকার মেয়েদের জন্য আমেরিকার শ্রেষ্ঠ সময় বলা যায়।' '...কিন্তু তৎসত্ত্বেও নারীত্বকে নারীর আভ্যন্তরীণ শক্তি হিসেবে উপস্থাপন না করে একটি সমস্যা হিসেবে উপস্থাপন করে চলেছে আমাদের সংস্কৃতি। অথচ সময় হয়তো এসেছে এ বিষয়ে উৎসাহব্যঞ্জক বার্তা দেওয়ার।' '...চতুর্দিকে 'গার্ল পাওয়ার' বা 'এম্পাওয়ারমেন্ট' সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন, পোস্টারাদি মিডিয়া কম্যুনিকেশনের বন্যা আদতে নারীত্ব সম্পর্কে মনের ভিতরকার রক্ষণশীলতা ও হতাশারই প্রকাশ বলে আমার মনে হয়।' '...এমনকী নারীর সর্বশ্রেষ্ঠ শারীরিক সক্ষমতা, অর্থাৎ কিনা নতুন প্রাণকে পৃথিবীতে নিয়ে আসার সক্ষমতাকেও নারীর একধরনের দুর্বলতা হিসেবেই প্রচার করা হয়।' '...একথা সত্য যে গর্ভাবস্থা এবং সন্তান জন্ম দেওয়া নারীর পক্ষে ঝুঁকিপূর্ণ, এমনকী প্রাণঘাতীও হতে পারে, কিন্তু সন্তানধারণ এক অসম্ভব শক্তিরও প্রকাশ! এতটাই, যে বহু কষ্ট ও যন্ত্রণা সত্ত্বেও তিন তিনবার সন্তানধারণ করেছি আমি এবং সেই বিষয়টিকে এক বিরাট সাফল্য হিসেবে দেখি। শারীরিক বা মানসিকভাবে মানুষের অন্য কোনো কাজই সন্তান জন্ম দেওয়ার কাজটির সঙ্গে তুলনীয় নয়। নিজদেহে নতুন প্রাণের সৃষ্টির প্রতিটি অনুভূতিকে উপলব্ধি করার এবং নিজ প্রজাতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার যে অলৌকিক আনন্দ, বহু নারীর কাছেই তা বিস্ময়কর।'

'...অনুরূপভাবে, শিশুকে স্তন্যদান করার বিষয়টিকেও আমরা ছোটো করে দেখি। মা হিসেবে নিজ সন্তানকে স্তন্যদান করার অনুভূতির যে গভীরতা এবং স্তন্যদানকালে মায়ের রক্তে অক্সিটোসিনের প্রবল প্রবাহ শিশু ও মায়ের মধ্যে গড়ে তোলে যে বন্ধন, সে বিষয়েও আলোচনা করা আমাদের উচিত।' '...নারী সৌভাগ্যময়ী। অথচ নারীর সৌভাগ্য, দৃঢ়তা ও সহিষ্ণুতার কথা ততখানি আলোচিত হয় না যতখানি হওয়ার কথা'। '...এইসব বিষয়ে তত কথা না বলার মাধ্যমে নারীত্বকে নারীর দুর্ভাগ্য বলে মনে করার যে প্রচলিত সংস্কৃতি আমাদের রয়েছে সেই সংস্কৃতিকেই হয়তো নিজেদের অজান্তেই সমর্থন করে ফেলি আমরা।' '...আধুনিক নারী আন্দোলনের অর্ধশতাব্দী পর নারী আন্দোলনের ফলে যে সুবিধাগুলি আমরা প্রাপ্ত হয়েছি সেগুলি সম্বন্ধে কথা বলাই আমাদের উচিত। লিঙ্গ পার্থক্যকে স্বীকার করার অর্থ অবশ্যই বৈষম্যকে স্বীকার করা নয়।' '...একথা অনস্বীকার্য যে মার্কিন সমাজের বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক শক্তিগুলিই আজও সমাজে নারীর অবস্থানকে প্রভাবিত করে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে নারীরা কোন দৃষ্টিতে নিজেদেরকে দেখবে সেটিও তারাই স্থির করবে। লিঙ্গ পার্থক্য বাস্তব সত্য হলেও লিঙ্গ সম্পর্কিত স্টিরিওটাইপগুলি সত্য নয়।' '...নারীবিদ্বেষের প্রতিরোধের উপায়ও আছে। তাদের জানা উচিত যে কন্যাকে দুর্বল বলে মনে করা হলেও কন্যা আসলে শক্তিশালিনী এবং যত কম মনে করা হয় তার চাইতে ঢের বেশি বলশালিনী।' '...সবচাইতে বড়ো কথা হলো— নারীত্ব যে পরম প্রাপ্তি এবং নারী হিসেবে জন্মগ্রহণ করা যে পরম সৌভাগ্যের বিষয়, সেই উপলব্ধি কন্যাদের মধ্যে আসা অবশ্যক।'

২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে মার্কিন নারী পামেলা পওল যে উপলব্ধির কথা লিখেছেন ভারত সভ্যতা তাকে মান্যতা দিয়ে এসেছে না-জানি আজ কত সহস্র বছর ধরে। প্রাচীন ভারত সভ্যতা ও ভারতশাস্ত্রসমূহ বরং নারীকে জ্ঞান করে শক্তির উৎস হিসেবে। ষাটের দশকে আমেরিকার নারী আন্দোলনের মাধ্যমে পাশ্চাত্যের নারীরা চেয়েছিলেন তাঁদের নারীত্বকে একপ্রকার অস্বীকারই করতে। আজ, তার অর্ধশতাব্দীরও অধিককাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর তাঁরা উপলব্ধি করতে শুরু করেছেন যে নারীত্ব অস্বীকার করার নয়, বরং পরম প্রাপ্তি ও মহা সৌভাগ্যের বিষয়। তাঁরা আরও উপলব্ধি করছেন যে 'পুরুষ' হয়ে ওঠার প্রচেষ্টায় নয়, বরং নারীত্বের অপরিসীম শক্তির পূর্ণ প্রকাশ ঘটে মাতৃশক্তির আধারে। এর দ্বারা পাশ্চাত্যের নারী আন্দোলনের একখানি বৃত্ত যেন হলো সম্পূর্ণ।

ঠিক এই একই প্রকারে ভারতীয় নারীর ক্ষেত্রেও এখন সময় স্ব-বোধের শিকড়ে ফেরার। স্মরণ করা আবশ্যক। কী প্রকার নারী সমাজ গঠনের দায়িত্ব ভগিনী নিবেদিতাকে দিয়েছিলেন স্বামীজী। পুনরোপলব্ধি করতে হবে যে সমাজে সর্বপ্রকার বিদ্যা ও শক্তির আবাহনে মাতশক্তির পুনর্জাগরণ অপরিহার্য। এহেন লক্ষ্যের সাধনে ভারতীয় নারীকে যেমন নিজেদেরকে নিবেদন করতে হবে স্ব-বোধজাগরণের মহাযজ্ঞে, ভারত দেশকেও তেমনই উৎসুক নয়নে চাইতে হবে তার নারীর মুখপানে। দেশের জনসংখ্যার প্রায় পঞ্চাশ শতাংশই যেখানে নারী, সেখানে নারী সম্পদের উপযুক্ত সদ্ব্যবহার করতে পারলে 'উন্নত দেশ' হয়ে ওঠার জন্য ১৪০ কোটির দেশে গ্রস ডোমেস্টিক প্রডাক্টের বৃদ্ধি এবং বৃদ্ধির হার সংক্রান্ত বিষয়গুলিতে ভারতীয় অর্থনীতিবিদদের আর অধিক চিন্তা বুঝি-বা করতে হবে না। □

স্টেডিয়াম তো হলো, হকির কাজে লাগবে কি!

নিলয় সামন্ত

শেষ হলো ১২৬তম বেইটন কাপ হকি টুর্নামেন্ট। ভারতের প্রাচীনতম এবং বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন টুর্নামেন্ট এটি। বরাবরই কলকাতায় হয়ে আসছে। সমস্ত জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক হকি টুর্নামেন্ট যখন অ্যাস্ট্রোটার্ফে খেলা হচ্ছে তখন গত বছর পর্যন্ত এই টুর্নামেন্টের খেলা ঘাসের মাঠেও হয়েছে। গত বছর ডুমুরজোলার স্পোর্টস কমপ্লেক্সে কিছু ম্যাচ হয়েছে অ্যাস্ট্রোটার্ফে। তার আগেও সল্টলেকের সাইকমপ্লেক্সে অ্যাস্ট্রোটার্ফে এই টুর্নামেন্টের খেলা হয়েছে। কিন্তু সারা ভারতে এর পরিচিতি ছিল ঘাসের মাঠে খেলা হয় বলে। সেই দুর্নাম এবার কাটলো।

১৯৮২ সালে দিল্লিতে এশিয়ান গেমসের আসর বসেছিল। তখন ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে অ্যাস্ট্রোটার্ফ পাতা হয়েছিল। আর সেখানেই ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের সোনা ও রুপোর লড়াই হয়েছিল। জাফর ইকবালের নেতৃত্বাধীন ভারত সেবার পাকিস্তানের কাছে ৭-১ গোলে হেরে রুপো জিতেছিল। সেটাই ছিল হকি খেলায় ভারতের পিছিয়ে পড়ার শুরু। শেষ প্যারিস অলিম্পিকে ভারত ব্রোঞ্জ পদক জয় করে। তারা ইউরোপের টিম স্পেনকে পরাজিত করে। মনে রাখতে হবে অশ্বিনী কুমারের নেতৃত্বাধীন ভারতের হকি ফেডারেশনের কর্তারা যারা ১৯৬৯ সাল থেকে কাজ করে আসছিলেন তাঁদের ভুলেই ভারতের এই দুরবস্থা হয়।

এবারের বেইটন কাপের সেমিফাইনালে খেললো আর্মি, নেভি, এয়ারফোর্স আর কানাড়া ব্যাংক। প্রথম সেমিফাইনালে নেভি হারলো আর্মির কাছে আর দ্বিতীয় সেমিফাইনালে কানাড়া ব্যাংক হারলো এয়ার ফোর্সের কাছে। ফাইনালে আর্মি চ্যাম্পিয়ন হলো। তবে, নবনির্মিত বিবেকানন্দ হকি স্টেডিয়ামে বেইটন কাপের খেলা বেশ কিছু প্রশ্ন রেখে গেল। স্টেডিয়ামটি নাকি বেশ কিছুদিন আগেই সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। টুকটাক কিছু কাজ বাকি ছিল। সেই কাজ শেষ হয়েছে বেইটন কাপ চলাকালীনই। শোনা যাচ্ছিল কোনো একটা আন্তর্জাতিক ম্যাচ দিয়ে এই স্টেডিয়ামটির উদ্বোধন হবে। কিন্তু তা হলো না। তার বদলে শীতকালে হলো অকালবোধন।

তড়িঘড়ি করে হকি ইন্ডিয়ার শতবর্ষের দিন পশ্চিমবঙ্গের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস আর হকি বেঙ্গলের সভাপতি তথা দমকল মন্ত্রী সুজিত বসুর উপস্থিতিতে বেইটন কাপের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। আর তার আগের দিন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ভার্চুয়ালি স্টেডিয়ামটির উদ্বোধন করেন। বড়ো বড়ো হোর্ডিং পড়েছিল। তাতে একপাশে মুখ্যমন্ত্রী আর এক পাশে দমকল মন্ত্রীর ছবি।

সেই সঙ্গে বিনামূল্যে হকি খেলা দেখা যাবে তার ঘোষণা। আমি ১৯৯০-এর দশকের গোড়ার থেকে সাংবাদিক হিসেবে যুবভারতীতে বহু ফুটবল ম্যাচ কাভার করেছি। অনেকবারই দেখেছি পুলিশ এবং নিরাপত্তারক্ষীরা বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে। কখনো বলা হয়েছে এই গেট নয়, ওই গেট দিয়ে ঢুকতে হবে। এইভাবে হয়রানি। চিত্রটা এখনো বদলায়নি।

এবার আমার আগে আগে একদল ছেলে-মেয়ে হকি খেলা দেখবে বলে যুবভারতীর মূল গেট দিয়ে ঢুকতে গেল। বিশালাকায় পাল্লাটি ভেজানো। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। আমি গিয়ে একটু ঠেলে ঢুকলাম। তারাও ঢুকলো পেছন পেছন। সঙ্গে সঙ্গে নিরাপত্তা রক্ষীদৌড়ে এসে বলল কোথায় যাবেন? বললাম হকি মাঠে যাব। তিনি বললেন টিকিট কোথায়? আমি বললাম আপনারা ভেতরে থাকেন বাইরে কী লেখা আছে দেখেন না? উত্তর পেলাম কী লেখা আছে? বললাম হকি খেলা বিনা পয়সায় দেখা যাবে। সিকিউরিটি উত্তর দিল, যা লেখা থাক আমার কাছে এই গেট দিয়ে ঢুকতে দেওয়ার কোনো অর্ডার নেই। অন্য গেট দিয়ে ঢুকুন। কোন গেট দিয়ে? কোনো উত্তর দিতে পারলেন না। শুধু বললেন এই গেট দিয়ে ঢোকার কোনো অনুমতি আমরা দিতে পারবো না।

ফোন করলাম বেঙ্গল হকির বর্তমান সেক্রেটারি ইশতিয়াক আহমেদকে। তিনি সব শুনে বললেন ফোনটা স্পিকারে দিন। সিকিউরিটি শুনে বলল ঠিক আছে যান। ছেলে-মেয়েরা বেশ খুশি হয়ে ঢুকে পড়ল হই হই করে। শুধু বোর্ড লাগালে যে হয় না, মানুষকে ঢোকার অনুমতিও দিতে হয় সেটা বোধ হয় এই মন্ত্রীদের জানা নেই। মাঠে ঢুকে শুনলাম আরও সাংঘাতিক কথা। এই টুর্নামেন্ট শেষ হয়ে গেলে নাকি সমস্ত গেট তালা বন্ধ করে রাখা হবে। হকি খেলার জন্য ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না। কিন্তু প্রশাসকরা এটা জানেন না এই অ্যাস্ট্রোটার্ফ ব্যবহার না করলে নষ্ট হয়ে যায়। ফলে কুড়ি কোটি টাকা ব্যয় করে যেটা নির্মাণ করা হয়েছে সেটা নষ্ট করে ফেলার রাস্তা তারাই দেখাচ্ছেন।

নবনির্মিত এই হকি স্টেডিয়ামটাও বেঙ্গল হকির নয়। অথচ এখানে হকির বদলে অন্য কোনো ধরনের খেলা, খেলা যাবে না। ফলে, ফুটবলের মতোই আজ পুলিশ নেই তো কাল কর্মী নেই এভাবে নানা বাহানায় নতুন তৈরি এই হকি স্টেডিয়ামটা বোধহয় হকি অ্যাসোসিয়েশনের কোনো কাজেই লাগবে না।

ছবিতে দেখা যাচ্ছে আপনারা কীভাবে অ্যাস্ট্রোটার্ফে জল দিতে হয়। খেলা শুরুর আগে আর হাফ টাইমে অর্থাৎ সেকেন্ড কোয়ার্টারের পর এই ভাবে জল দেওয়া হয়। এই জল দেওয়া যদি নিয়মিত না হয় তাহলেই অ্যাস্ট্রোটার্ফটি সম্পূর্ণ খেলার অযোগ্য হয়ে যাবে।

মেয়েরা মায়েরই আরেক রূপ

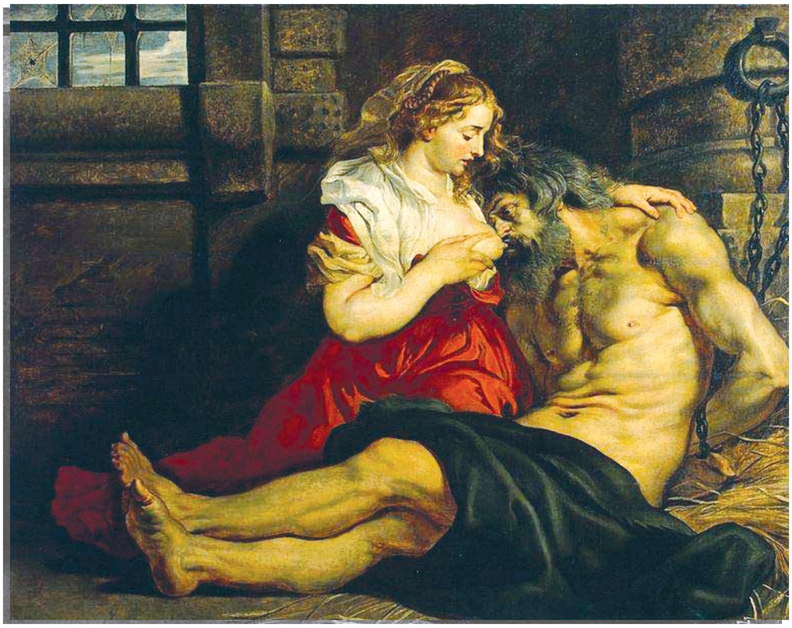

অনেকদিন আগেকার কথা। ইতালির রোম নগরীতে অভূতপূর্ব এক ঘটনা ঘটেছিল। সিমন নামে এক বয়স্ক মানুষ এক রুটি তৈরির কারখানায় কাজ করত। কারখানায় কর্মচারীদের খুব সামান্যই খাবার দেওয়া হতো। সিমন একদিন খিদে সহ্য করতে না পেরে একটি রুটি চুরি করে আড়ালে নিয়ে গিয়ে খেতে বসল। ঠিক সেই সময়ই বেকারির মালিক তাকে হাতেনাতে ধরে ফেলে। আদালতের বিচারে সিমনকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হয়। অনাহারে মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তাকে কারাগারে রেখে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।

সিমন নামের দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত অভিযুক্তের যুবতী কন্যা পেরো তার বাবার এই নিষ্ঠুর পরিণতি মেনে নিতে পারেননি। তখন পেরো সবে মা হয়েছে। তার একটি কন্যা হয়েছে। সে কারাগারে গিয়ে প্রতিদিন তার বাবার সঙ্গে দিনের একটি সময় দেখা করার আবেদন জানায় বিচারকের কাছে। বিচারক তার আবেদন মঞ্জুর করেন।

সেই মতো পেরো প্রতিদিন পোশাকের ভেতরে খাবার লুকিয়ে তার বাবার সঙ্গে দেখা করতে যায় এবং কারারক্ষীদের অগোচরে সেই খাবার বাবাকে খাইয়ে দেয়। কিন্তু একদিন কারারক্ষীরা তার দেহ তল্লাশি করে খাবারগুলো কেড়ে নেয় এবং সতর্ক করে যে, এরপর যদি এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে তাহলে তাকে আর তার বাবার সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হবে না।

পিতা অন্তঃপ্রাণ পোরো তার পরদিন কারাগারে গিয়ে দেখে, তার বাবার হাত পিছমোড়া করে বাঁধা। ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় ছটফট করছেন তিনি। এমন করুণ দৃশ্য দেখার পর সদ্য মা হওয়া পেরো আর সহ্য করতে পারে না। বাবাকে বাঁচাতে তখনই নিজের বুকের দুধ পান করায়। এতে কিছুটা বল ফিরে পায় তার বাবা। বাবার জীবন রক্ষা করার তীব্র ব্যাকুলতা থেকে দিনের পর দিন বাবার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে বাবাকে দুধ পান করাতে থাকে পেরো।

এদিকে দীর্ঘদিন অভুক্ত থাকার পরও কীভাবে বেঁচে আছে সিমন, কেন সে মারা যায়নি, তা কারাকর্তৃপক্ষকে ভাবিয়ে তুলল। অবশেষে একদিন হাতেনাতে ধরা পড়ে যায় পেরো। কালবিলম্ব না করে উভয়কে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করনো হয়। বিচারসভায় রোমের বিচারকরা সম্পূর্ণ ঘটনা শুনে চরম বেদনা অনুভব করেন। বিষয়টিকে তাঁরা মানবতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত বলে রায় দেন। রায়ের পর রুটি কারখানার মালিকের মনে মানবতাবোধ জাগ্রত হয়। এরপর পেরো ও তার বাবা উভয়কে মুক্তি দেওয়া হয়। হৃদয়কে নাড়া দেওয়ার মতো এই ঘটনা দাবানলের মতো ছাড়িয়ে পড়ে চারদিকে।

এই ঘটনাটি পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের নিঃস্বার্থ কর্তব্যের জ্বলন্ত উদাহরণ। এত বছর পর আজও একটি মেয়ের তার বাবার প্রতি ভালোবাসা কতটা গভীর তার আদর্শ উদাহরণ হিসেবে বিবেচনা করা হয় পেরোকে। সেই থেকে একথাটি প্রমাণিত সত্য রূপে প্রতিষ্ঠিত হয় যে, কন্যাসন্তান আসলে মায়েরই আরেক রূপ।

সংগৃহীত

জাতীয় উদ্যান

কাসু ব্রহ্মানন্দ রেড্ডি

কাসু ব্রহ্মানন্দ রেড্ডি জাতীয় উদ্যান অধুনা তেলেঙ্গানা রাজ্যের হায়দরাবাদের জুবিলি হিলস এবং বানজারা পাহাড়ে অবস্থিত। উদ্যানটির আয়তন ১.৬ বর্গকিলোমিটার। এটি শহরের মধ্যে একটি উদ্যান যা ব্যস্ত নগর জীবন এবং ক্রমবর্ধমান দূষণের মাত্রা থেকে মুক্তি পেতে চমৎকার পরিবেশ প্রদান করে। উদ্যানটিতে ৬০০ রকমের গাছপালা, ১৪০ প্রজাতির পাখি এবং ৩০ রকমের প্রজাপতি ও সরীসৃপ রয়েছে। বন্যপ্রাণীর মধ্যে প্যাঙ্গোলিন, বনবেড়াল, শজারু, বিভিন্ন রকমের ভাম রয়েছে। উদ্যানের ভেতরেই রয়েছে চিরাগ প্রাসাদ, ময়ূর বাংলো, গোল বাংলো যা হাতি, ঘোড়া এবং গবাদি পশুর আস্তানা। সন্ধ্যায় এবং প্রতি শনিবারে ছোটো-বড়ো সকলেই এই উদ্যানে যাতায়াত করতে পারেন।

এসো সংস্কৃত শিখি-৯০

দ্বিতীয়া বিভক্তি:, গমনার্থে (ভাগ:-৩)

यत्र गमनं भवति तत्र द्वितीया विभक्तिः भवति।

ग्राम: – ग्रामम्। देश: – देशम्।

देवालय: – देवालयम्। वाटिका – वाटिकाम्।

अमेरिका – अमेरिकाम्। काशी – काशीम्।

राजधानी – राजधानीम्।

रञ्जन: विद्यालयं गच्छति।

सुमन: देहलीं गच्छति।

सुमित्रा मन्दिरम् गच्छति।

अहं ग्रामं गच्छामि।

(पाठशाला, कार्यालय:, विदेश:, गृहम्, राज्यम्, नदी, वाराणसी)

अहं উদাহরণ হিসেবে দেওয়া আছে, এবার अहम्, भवान्, भवति, स:, सा, एषा, क:, का, राम: ইত্যাদি দিয়ে বাক্য রচনা করতে হবে।

ভালো কথা

টারজান

গত মাসে আমার ছোটো কাকু মর্নিংওয়াক করে ফেরার সময় হাতে করে একটা লাল কুকুরছানা নিয়ে এসেছিল। ছানাটি খুবই ছোটো আর রোগা ছিল। ছানাটিকে কেউ নাকি ফেলে দিয়ে গিয়েছিল। ছোটোকাকু একটি নারকেলের মালাতে করে একটু দুধ দিতেই ওটা চুক চুক করে খেয়ে নিল। দিনে বেশ কয়েক বার দুধ খাওয়াতে হতো। সাতদিন পরেই ছানাটি বেশ মোটা দেখতে হলো। ছোটো কাকুর ঘরেই ওটা একটা ছেঁড়া চটের উপর রাতে ঘুমায়। পনেরো দিনের মধ্যে আরও নাদুসনুদুস হয়ে গেল। ছোটো কাকু বলল এটার নাম টারজান রাখলাম। এখন টারজান বলে ডাকলেই ছুটে আসে। সকালে আমি যখন পড়তে বসি তখন টারজান আমার কাছে এসে বসে থাকে। কাকু অফিসে আর আমি স্কুলে গেলে ঠাকুমার কাছে থাকে। এখন দুধভাত খেতে শিখেছে।

অনিন্দ্য মাহাত, অষ্টমশ্রেণী, রানিবাঁধ, বাঁকুড়া

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

শীতের মজা

দেবারতি হালদার, নবমশ্রেণী, ক্যানিং, দঃ ২৪ পরগনা

ধীরে ধীরে আসছে শীত
লাগছে খুবই মিঠি মিঠি,
বিরক্তিকর গরমকালটি
পালিয়ে যাচ্ছে গুটি গুটি।
শীতকালেতে খুবই মজা
কত কিছুই খাওয়া–
খেজুর রস আর নলেনগুড়
সাথে হিমেল হাওয়া।

খাওয়ার সাথেই রংবেরঙের
পোশাক থাকে থাকে,
ছোটোরা যেন প্রজাপতি
কেবল উড়তে থাকে।
বড়োরা তখন জবুথবু
লেপের তলায় থাকে,
গরিবরা তখন মনের সুখে
আগুন পোহায় রাতে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/ সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪ ৯০৫১৭২১৪২০

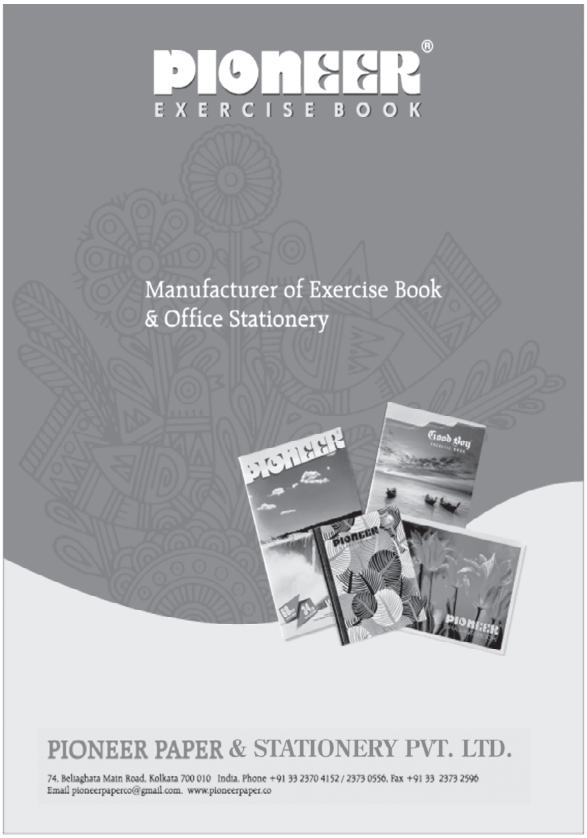

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

কি জন্য করবেন?

- ★ RETIREMENT PLANNING.
- ★ CHILDREN EDUCATION FUND.
- ★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
- ★ WEALTH CREATION.
- ★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

DRS INVESTMENT 8240685206 9748978406

Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com

NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

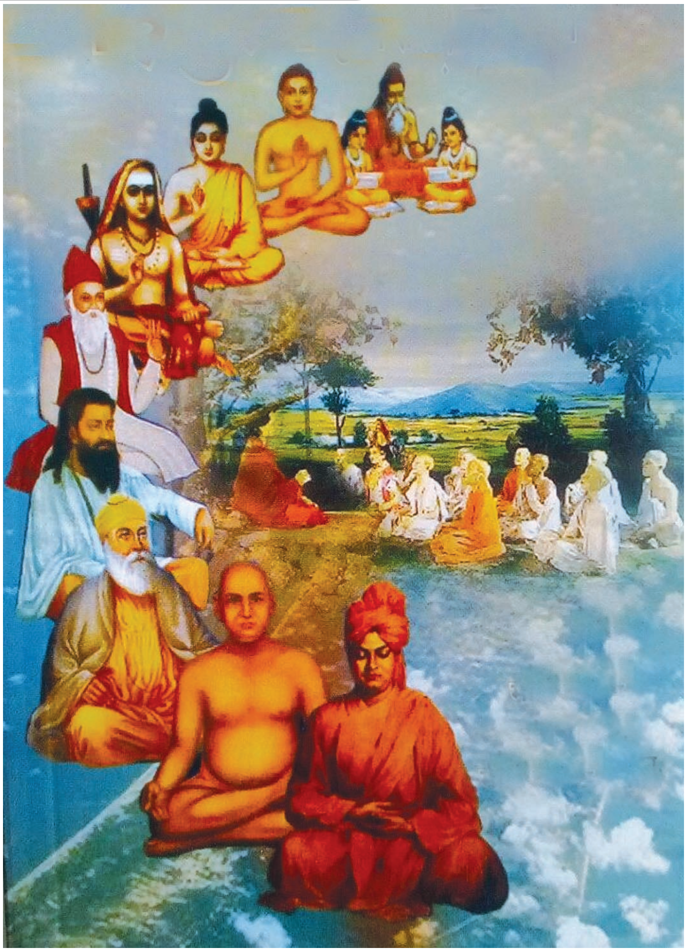

হিন্দুত্বের সংজ্ঞা বর্তমানের প্রেক্ষিতে

শ্রী অরুণ কুমার

সঙ্ঘকার্য শুরু হবার সময় থেকেই হিন্দুত্বের ধারণা নির্মাণের কাজ চলে আসছে। সেইজন্য 'হিন্দুত্বের সংজ্ঞা' বিষয়টি কোনো নতুন নয়, কিন্তু বর্তমানে এই বিষয়ে পুনরায় কেন চিন্তা ভাবনার প্রয়োজন রয়েছে সে সম্বন্ধে আলোচনার আবশ্যকতা রয়েছে। আজ পর্যন্ত আমরা সংগঠনের মধ্যেই আবদ্ধ থাকার ফলে স্বয়ংসেবক দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনের প্রতি সমাজ যথাযথ লক্ষ্য দান করেনি। নিজেদের সংগঠনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে আমরা যা কিছু বলেছি তা আমাদের সংগঠনের স্বয়ংসেবক ও কার্যকর্তারাই কেবলমাত্র জানতে পেরেছে। এত বছরে আমাদের সংগঠন ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে সমাজের কেন্দ্রে এসে পৌঁছেছে এবং আমাদের নেতৃত্বকেও সমাজ গ্রহণ করেছে। আমরা যে বক্তব্য রাখছি জনতা তার সূক্ষ্ম বিচার ও বিশ্লেষণ করছে। সঙ্ঘের বক্তব্য কেবলমাত্র অখিল ভারতীয় বা প্রাদেশিক কার্যকর্তাগণই প্রদান করছেন না। আমাদের সাধারণ একজন কার্যকর্তা ও সামাজিক প্রচারমাধ্যমে বর্তমানে সঙ্ঘ কার্যালয়ে পূজনীয় ডাক্তারজীর বা বর্তমান পূজনীয় সরসঙ্ঘচালক ডাঃ মোহনরাও ভাগবতের ছবি লাগিয়ে কিছু না কিছু বার্তা প্রদান করছে যা সঙ্ঘের মতামত বলেই ধারণা করতে হবে। এই কারণে এখন যে বক্তব্য রাখার প্রয়োজন তাতে সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। কেননা হিন্দুত্ব বিষয়ে এমন কিছু বক্তব্য রয়েছে যার পুনর্বিচার করা এখন একান্ত প্রয়োজন।

হাজার বছরের সংগ্রাম—প্রভাব ও পরিণাম

জাতীয় জীবনে এক হাজার বছরের পটভূমিকাতে আমরা আজ কর্মরত। ইসলামের আক্রমণের ফলে ভারতের প্রতিষ্ঠানগুলিই কেবলমাত্র ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়নি, সমাজ কুরীতি ও অপসংস্কারেরও শিকার হয়েছে। ইংরেজদের সর্বব্যাপী আক্রমণের ফলে আমাদের স্বকীয়তার বিস্মৃতি ঘটেছে, আমাদের মৌলিক ভিত্তি বা মূল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছি। ক্রমানুসারে আমরা বিগত শতব্দীতে দুই ধরনের মতাদর্শের সম্মুখীন হয়েছি, যথা—সাম্যবাদ ও বৈশ্বিক বাজারবাদের শক্তি। এই দুই মতবাদই প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রিস্ট মতবাদ থেকে সৃষ্ট। এই দুই মতবাদের প্রভাবে আজ বিশ্লেষণাত্মক বক্তব্যের ভাষার ও বার্তালাপের প্রসঙ্গের পরিবর্তন ঘটেছে। সমাজেরও আলোচনার দিক পরিবর্তিত হয়েছে। নির্বাচনের অধিকার, সামাজিক সুবিচার, মানবাধিকার, সাম্য ইত্যাদি হলো বর্তমানের আলোচ্য বিষয়।

সমাজ কখনই স্থিতিশীল নয়, নিয়ত বিকাশশীলতা হলো এর ধর্ম। ভারতবর্ষের সমাজে রয়েছে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর প্রভাব। হাজার বছরের সংগ্রামেরও কিছু পরিণাম এবং শতবর্ষের মধ্যে যে সমস্ত ঘটনার সম্মুখীন আমরা হয়েছি তারও প্রভাব রয়েছে। এই সমস্ত কারণে আমাদের দেশে ভারতীয় মূল আদর্শের প্রতি ভুল ধারণা, অনাগ্রহ ও অবিশ্বাস সৃষ্টির এক পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে। পূর্বোক্ত সময়ে যা কিছু ঘটনা ঘটেছে তার মাধ্যমে সমাজে নতুন নতুন পরিচিতিও সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের সমাজে আগে কারও কখনই তপশিলি, আদিবাসী, অন্যান্য পশ্চাৎপদ জাতি ইত্যাদি পরিচয় ছিল না, কিন্তু এই সমস্ত পরিচয় আজ সর্বগ্রাহ্য হয়েছে। যেমন এই সমাজে আগে কোনো বর্গ বা শ্রেণী ছিল না, তেমনি ছিল না ভাষাভিত্তিক রাজ্য। বর্তমানে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে এই সমস্ত দিকগুলিই আমাদের পরিচিতির বিষয় হয়ে উঠেছে। এই সুবিশাল কালখণ্ডে আমাদের যে সব আস্থা ও শ্রদ্ধার কেন্দ্রবিন্দুগুলি ছিল যেগুলির প্রতি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সন্দেহ প্রকাশের মানসিকতা তৈরি করা হয়েছে। সমাজজীবনের নিত্য পরিবর্তনশীলতার কারণে কালানুসারে সমকালীন পরিস্থিতি অনুসারে একই আলোচিত বিষয়ের বিস্তৃত

ফঃ ৬

বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা প্রদান করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সেজন্য তথ্য সংবলিত বিশ্লেষণ পদ্ধতিও শিক্ষা লাভ করতে হয়।

এই পদ্ধতি আমাদের ঐতিহ্যসংগত। গীতার ঘটনাবলীর ও শ্লোকের কোনো পরিবর্তন না হলেও সময়ে সময়ে গীতার নতুন নতুন ভাষ্য রচিত হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে জগৎগুরু শঙ্করাচার্য, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী চিন্ময়ানন্দ এবং স্বামী অড়গড়ানন্দও একই কথা বলেছেন। সমস্ত সময়ে গীতার উপজীব্য তো অপরিবর্তনীয় কিন্তু ভাষ্যের সময়ানুযায়ী পরিবর্তন লক্ষণীয়। 'তুলসীকে রাম' নামে একটি পুস্তক রয়েছে যেটি পাঠ করলে উপলব্ধি হবে যে তুলসীদাসের ও বাল্মীকির শ্রীরামচন্দ্রের বর্ণনার মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। ইসলামি যুগে তাদের সঙ্গে সংগ্রামের সময় সমগ্র দেশ বৈষ্ণবভক্তি জাগৃতির ও শক্তির কেন্দ্রে রূপান্তরিত হয়। ইসলামের নিষ্ঠুর আক্রমণের ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং ভারতীয় সংস্কৃতি ও পঠনপাঠনের ঐতিহ্য প্রায় সমাপ্ত হয়ে যায়। ফলে সমাজে পুনরায় আশা ও বিশ্বাস সঞ্চারের জন্য সাধুসন্তদের কার্যকলাপ বৃদ্ধি পায়। বৈষ্ণব ভক্তিআন্দোলনের প্রভাবে সমগ্র দেশে একই সময়ে তামিল, বাংলা, অসমীয়া প্রভৃতি ভাষাতে রামায়ণ রচিত হয়। এই সময়েই তুলসীদাস রচনা করেন রামচরিত মানস, যার ফলে এই রামায়ণের উপজীব্য বিষয় সেই কালখণ্ডের অনুরূপ ভাবে রচনা করা হয়েছে। এই সময়ে সমাজ জীবনের উপযোগী ভাষ্য প্রদান করারও একান্ত প্রয়োজন ছিল।

আমাদের দায়িত্ব

এই কারণে 'হিন্দুত্ব', 'ভারত' প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনার সময় আমাদের মনে রাখতে হবে যে বিগত হাজার বছরের পটভূমিকা আমাদের সামনে রয়েছে। আমাদের কোনো বক্তব্যই নতুন নয়। বর্তমানে সমাজ যে সমস্ত প্রশ্ন করছে যেগুলির উত্তর দানের সময় চিন্তা করতে হবে যে যেন এরপর আর কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত না হয়, বরং উত্তর লাভ করে শ্রোতাদের মনে আগত অন্যান্য প্রশ্নেরও সমাধান যেন একই সঙ্গে হয়ে যায়। সংগঠনের মধ্যে যখন কিছু বলা হয় তখন পারস্পরিক বিশ্বাসের কারণে যে প্রসঙ্গে কথা বলা হয়, সেই প্রসঙ্গকে সকলেই অনুধাবন করতে পারে কিন্তু সংগঠনের বাইরের লোকেদের কাছে এটি সম্ভব হবে না। বক্তা যে প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখছেন, ব্যাখ্যাকারী হয়তো তার ভিন্ন ব্যাখ্যা করতে পারে, কারণ প্রত্যেকের অনুধাবন করার ক্ষমতা ভিন্ন ভিন্ন রয়েছে। আমাদের স্মরণে রাখতে হবে যে, আমরা যা কিছু বক্তব্য রাখছি, যে প্রসঙ্গে বার্তালাপ করছি সেই সমস্ত বিষয়ের কী তাৎপর্য রয়েছে। কিছু কথা এমন থাকে যা আমরা সহজভাবেই বলে থাকি, অতি সরল ভাবেই বলা হয় কিন্তু যা বলা হচ্ছে তার তাৎপর্য ও ভাব উপলব্ধি করে এবং সতর্কতা অবলম্বন করে পুনরায় হিন্দুত্বের যুগানুকূল ব্যাখ্যা দানের বিষয়ে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

বর্তমান সমাজে আমাদের গ্রহণীয়তা লক্ষণীয় বিষয়। ফলে সমাজের কিছু প্রত্যাশাও সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের আচরণ, ব্যবহার এবং আদর্শ সমাজের সকলকে একসঙ্গে সহযোগী করে চলার উপযুক্ত হওয়া দরকার। এই বিষয়েরও পশ্চাৎ ভূমিকা রয়েছে। এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং আমাদের তদনুরূপই আচার ব্যবহার করা কর্তব্য। বিগত দু'হাজার বছর ধরে সমগ্র বিশ্ব যে পথে অগ্রসর হচ্ছে তাতে সকলেই হাতাশাগ্রস্ত ও পরিশ্রান্ত। ইসলাম মজহব ও খ্রিস্টান রিলিজিয়ন যে বিশ্বের যে সব দেশে প্রভাব বিস্তার করেছে সেই সমস্ত দেশের বর্তমান পরিস্থিতি বিষয়ে সকলেরই তিক্ত অভিজ্ঞতা সৃষ্টি হয়েছে। বিগত শতবর্ষে বিশ্বের যেখানে সেখানে সাম্যবাদ, মার্কিনবাদ এবং বিশ্ব বাজারবাদ প্রভাবশালী হয়েছে সে সব দেশে লক্ষ্য করা যাচ্ছে পারস্পরিক সংঘর্ষ, পরিবেশগত প্রশ্ন, পারিবারিক ব্যবস্থার বিনষ্টি ফলে সমগ্র সমাজের সৃষ্টি হয়েছে অসন্তোষ, অবিশ্বাস ও অনাস্থার পরিবেশ। এই সমস্ত কারণে বর্তমানে সকলেরই অভিজ্ঞতা হয়েছে যে তাদের গৃহীত সমাজ ব্যবস্থার পরিকল্পনা সঠিক নয় এবং এই কারণেই আজ সমগ্র বিশ্ব এক বিকল্প পথের অনুসন্ধান করছে। এহেন বিকল্প পথের সন্ধান ভারতবর্ষ ব্যতীত আর কেউ দিতে সক্ষম নয় এই কারণে পূর্বোক্ত সমস্যাগুলির এবং প্রশ্নের সমাধান সমাজের সমক্ষে উত্থাপন করার মতো আমাদের যে আদর্শ ও উপায় অর্থাৎ 'হিন্দুত্ব' রয়েছে তার উপযুক্ত ব্যাখ্যা দানের শিক্ষা আমাদের অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে।

পরিভাষা দানে দুশ্চিন্তা নয়

'হিন্দু' শব্দের ব্যাখ্যা করার সময় হিন্দু শব্দের পরিভাষা বিষয়ে অনেক সময় ইতস্ততের ভাবনা মনে জাগে। এই বিষয়ের বিশ্লেষণের সময় দুর্ভাবনাগ্রস্ত না হওয়াই উচিত। কেননা সমগ্র বিশ্বে আমাদের চিন্তাধারা অন্যান্যদের থেকে স্বতন্ত্র। অন্যান্য মতবাদ কেবলমাত্র, একটি গ্রন্থের অবলম্বনে সৃষ্টি। একটি মতবাদ বা একটি সম্প্রদায় রূপে তাদের বিকাশ ঘটেছে সেই সমস্ত কারণে এই সমস্ত মতবাদের সংস্থান করা করা সহজ বিষয়। এদের পরিমণ্ডলে হিন্দুত্বের সংজ্ঞা দান করা সম্ভব নয়, কেননা আমাদের কোনো একটি বিশেষ গ্রন্থ নেই অথবা কোনো একজন মহাপুরুষ নেই। আমাদের বিকাশ যাত্রা পাঁচশো বা হাজার বছর ধরে চলছে না, সেই কারণে হিন্দুত্বের সংজ্ঞাদানের চেষ্টা যথাসম্ভব করলেও সম্পূর্ণভাবে তা ব্যক্ত করা যাবে না। স্মরণযোগ্য বিষয় হলো যে ভারতের এই সনাতন প্রবাহের নাম কালে কালে পরিবর্তিত হয়েছে। কখনও সনাতন, কখনও বৈদিক, কখনও-বা আর্য নামে অভিহিত হয়েছে কিন্তু এই প্রবাহের মূল আদর্শ ও তত্ত্বের কোনো পরিবর্তন কখনই হয়নি, একে যে শব্দেই চিহ্নিত করা হোক না কেন এর বিষয়বস্তু সর্বদা একই রয়েছে। ব্যবহারিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ প্রয়োগ করা হলেও সেগুলির মূলগত ভাব সর্বদা অপরিবর্তনীয়। এই তথ্য সর্বপ্রকারে প্রমাণিত যে বেদ থেকে শুরু করে উপনিষদ পর্যন্ত বিভিন্ন গ্রন্থে হিন্দু শব্দের উল্লেখ নেই। কারণ সেই সময়ে হিন্দু শব্দের প্রচলন ছিল না। কোনো কোনো ব্যক্তি খেয়ালখুলি মতো এই শব্দকে ওই সময়ের ক্ষেত্রেও যুক্ত করে থাকতে পারেন কিন্তু তা তথ্যসংগত নয়। পরবর্তীকালে বার্হস্পত্য শাস্ত্রে, বিষ্ণু পুরাণাদি কিছু গ্রন্থে এই শব্দের প্রয়োগ শুরু হলেও তার বহুল প্রচলন তখনও ঘটেনি। কারণ ওই সময়কালে রচিত বহু গ্রন্থেই এই শব্দের উল্লেখ নেই। কোথাও কোথাও কিছু উদাহরণ রয়েছে যেমন পারস্যদের গ্রন্থ জেন্দ-আবেস্তা যেখানে বর্ণনা রয়েছে যে সেখানকার রাজাকে কোনো এক অভ্যাগতের পরিচয়

দান কালে বলা হয়েছে যে, হিন্দ্ দেশ থেকে ব্যাস নামে এই ব্রাহ্মণ এখানে এসেছেন। এই হিন্দ্ দেশের প্রকৃত অর্থ হলো হিন্দুদের দেশ। এই কালখণ্ডে চীন দেশের বহু স্থানে ভারতের জন্য এই শব্দের প্রয়োগ করা হতো।

আমাদের দেশে বিগত দেড়হাজার বছর আগে থেকেই হিন্দু শব্দের প্রয়োগ শুরু হলেও বিগত হাজার-বারোশো বছরে ক্রমে ক্রমে এই শব্দের প্রচলন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি লাভ করে। হিন্দু শব্দের সর্বাধিক প্রয়োগ মুসলমানদের আক্রমণের কালখণ্ডে হয়েছে। কেননা মুসলমানেরা নিজেদের ছাড়া বাকি সকলকেই সমান শত্রু জ্ঞান করতো। বৌদ্ধ, জৈন, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি ভারতীয় ধর্মমতের লোকেরা তাদের কাছে কাফের নামেই পরিচিত ছিল। এদের সকলের জন্য এক শাস্তির বিধান দান করা হয়েছিল। এদের মূর্তি ও মন্দির ধ্বংস করা, তাদেরকে ধর্মান্তরিত করা, তাদের প্রতি অত্যাচার করা এবং অবলীলাক্রমে তাদেরকে হত্যা করাই ছিল মুসলমানদের একমাত্র উদ্দেশ্য। এই মতবাদ অনুযায়ী অন্য সম্প্রদায়ের মানুষের জীবিত থাকার কোনো অধিকার নেই। সেই কারণে ক্রমে ক্রমে ভারতীয় সম্প্রদায়গুলির জনগোষ্ঠীর উপলব্ধি করতে থাকে যে এই ধরনের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে এবং এদের সঙ্গে সংঘর্ষ করতে হলে সম্প্রদায়ের পার্থক্য ভুলে সকলকেই সমান পরিচিতি গ্রহণ করে ঐক্যবদ্ধ জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে হবে। ফলে কালক্রমে সকলেরই এক সমান পরিচিতির বিকাশ ঘটে। এই সহস্রবর্ষের কালখণ্ডে যে সমস্ত পূজ্য সাধুসন্তের আবির্ভাব ঘটেছিল তাঁরা সকলেই এই একটি শব্দ অর্থাৎ 'হিন্দু' শব্দের প্রয়োগ করতে শুরু করেন। গুরু নানাকজী বাবরের আক্রমণের বর্ণনা দান করার সময় সমস্ত সম্প্রদায়ের জনতার জন্য এই একটিই পরিচিতির উল্লেখ করেছেন। মুসলমানেরা আক্রমণকারী সেই কারণে আক্রান্তদের জন্য তিনি এই শব্দ প্রয়োগ করেছেন—এই আক্রান্তরা কে?—এর উত্তর হলো যে এরা 'হিন্দু'।

বিগত ১০০-১৫০ বছরের মধ্যে এই হিন্দু শব্দ সম্পূর্ণ সমাজের পরিচিতি হিসাবে বিকাশলাভ করে অর্থাৎ আমাদের সমাজের নাম হিন্দু হিসেবে সমগ্র বিশ্বে পরিচিতি লাভ করে। হাজার হাজার বছর ধরে প্রবহমান জীবনমূল্যবোধ অনুসারে জীবনযাত্রী নির্বাহনের পদ্ধতিই হিন্দু-সংস্কৃতি নামে চিহ্নিত হয় এবং এই সময়েই এই দেশ হিন্দুরাষ্ট্রে পরিণত হয়। হাজার বছরের প্রবাহে হয়তো শব্দগত কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে কিন্তু এই দেশের দর্শন, মূল্যবোধ, সংস্কৃতি প্রভৃতি সমানরূপে প্রবহমান রয়েছে। বৈদিক হোক বা অবৈদিক, প্রত্যেকের মূল্যবোধ সমান। সাধারণত সমাজে ধর্ম ও রিলিজনকে কেন্দ্র করে বিবাদ সৃষ্টি হয়ে থাকে। জনতা অজ্ঞতার কারণে রিলিজিয়নের দৃষ্টিভঙ্গিতে ধর্মকে বুঝে থাকে। ধর্ম ও রিলিজিয়নের পার্থক্য বিষয়ে বহুবার ব্যাখ্যা দান করা সত্ত্বেও সমাজে তার কোনো প্রভাব সৃষ্টি হয়নি, যার কারণে শিক্ষিত মানুষও ধর্ম ও রিলিজিয়নকে সমার্থক হিসাবেই গ্রহণ করেছে। আমাদের ঐতিহ্যে ধর্ম শব্দকে গ্রহণ করা হয়েছে মহাজাগতিক নিয়মকে অন্বেষণ করে। এই নিয়মেই জাগতিক পদার্থের গুণ ও ধর্ম সৃষ্টি হয়েছে, যেমন রয়েছে অগ্নি বা বায়ু ইত্যাদির ধর্ম। এই কারণে আমাদের সমাজে বা সমাজজীবনে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির সামাজিক ভূমিকা লক্ষ্য করে তার সঙ্গে ধর্ম শব্দকে যুক্ত করা হয়েছে, যেমন রাজার ধর্ম হলো রাজধর্ম, পিতার ভূমিকা হলো পিতৃধর্ম ইত্যাদি। দীর্ঘকাল যাবৎ এই ধর্মের সঙ্গে উপাসনার বা পূজাপাঠের কোনো সম্পর্ক ছিল না। আমাদের এখানে ধর্ম শব্দকে প্রত্যেক ব্যক্তির কেবলমাত্র ভূমিকা বা কর্তব্যের সঙ্গে সম্পর্কিত করা হয়েছে, যেমন কৃষকের ধর্ম, ব্যবসায়ীর ধর্ম, রাজা বা প্রজার ধর্ম ইত্যাদি।

জীবন লক্ষ্য

জীবনযাত্রা পরিচালনার দৃষ্টিতে আমাদের দেশে চারটি পুরুষার্থের বিধান দেওয়া হয়েছে—ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। ধর্মের উপর নির্ভর করে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে অবশেষে মোক্ষ লাভ করতে হবে। এই যাত্রা হলো এক থেকে বহুর দিকে এবং সর্বশেষে আবার বহু থেকে একে মিলিত হওয়া—এই হলো জীবনলক্ষ্য। বহু থেকে একে পরিণত হওয়াতে একটি সত্য সুনিশ্চিত ও অপরিবর্তনীয় যা হলো সকলের ঈশ্বর সমান অর্থাৎ ঈশ্বর এক কিন্তু তার স্বরূপ বিভিন্ন। সেই কারণে ঈশ্বরের নিকটে পৌঁছানোর জন্য নির্ধারিত পথ বা উপায় বিভিন্ন কিন্তু সকলের গন্তব্য স্থান হলো সমান। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ বিভক্ত হলেও সকলের লক্ষ্য কিন্তু সমান—এই ভাবনাই ভারতে বিকশিত হয়েছে। সেই কারণে মোক্ষ লাভের জন্য যে কোনো উপায় অবলম্বন করা হলেও ধর্মানুসারে প্রত্যেকে একই লক্ষ্যে এসে পৌঁছাবে। ফলে এই দেশে সম্প্রদায় অনুসারে মোক্ষ-ধর্মের নামের পরিবর্তন হতে থেকেছে। ভারতবর্ষে আজ তো বহু ধর্মের কথা শুনতে পাওয়া যায় কিন্তু প্রথমে এই ধর্মের কোনো নাম ছিল না, পরবর্তীতে বিভিন্ন উপাসনা অনুসারে সম্প্রদায়গুলির নামকরণ করা হয়েছে। বৌদ্ধধর্মের নাম প্রথমে বৌদ্ধধর্ম ছিল না। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উপাসনাগত সমস্ত আচার-পদ্ধতিকেই 'ধম্ম' শব্দে অভিহিত করা হতো। এখানে সত্য, শীল ও করুণার কথা বলা হয়েছে যেগুলি এক একটি গুণবাচক শব্দ। সমস্ত মহাপুরুষ প্রথমে মতবাদের প্রচার করেছেন এবং পরবর্তীতে সেই মতবাদের নামকরণ করা হয়েছে। গুরু নানকজী প্রথমে মনুষ্যের জীবনযাত্রা নির্বাহের পদ্ধতি বিষয়ে প্রচার করেন এবং পরবর্তীতে সেই মতবাদের নাম হয় 'শিখপন্থ'। কিন্তু বিভিন্ন ধর্মপ্রবর্তক যে সমস্ত উপদেশ দান করেছেন সেগুলির মধ্যে অভিন্নতা লক্ষ্য করা যাবে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মতবাদের মূল বিষয় হলো সৎ, চিৎ ও আনন্দ স্বরূপকে জানা, তেমনি কর্ম সিদ্ধান্ত যেমন পুনর্জন্ম, পরোপকার করা, সেবা ধর্ম ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে প্রত্যেকেই সমান আগ্রহ প্রকাশ করেছেন এবং জীবনযাত্রা নির্বাহের উপায় বা পন্থা বিষয়ে সকলের সমান মনোভাব লক্ষ্য করা যাবে। বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত ইত্যাদি মতাবলম্বীগণের মধ্যে পূজা-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, গৌতম বুদ্ধ ও মহাবীর জৈনকে কেউ কেউ মান্যতা দান করেছেন, কিন্তু বর্তমানে হিন্দু অর্থাৎ সনাতন অর্থে মূর্তিপূজা ও বিশেষ পদ্ধতিতে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা—এই ধারণা স্থায়ী হয়ে গেছে।

জীবনযাত্রা নির্বাহের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তির ভূমিকা অনুসারে যেমন বিভিন্ন ধর্মের নামকরণ করা হয়েছে, তেমনি প্রত্যেকের জন্য নির্ধারিত হয়েছে মোক্ষধর্ম। এই মোক্ষধর্ম সমগ্র ভারতেই বিদ্যমান।

ভারতে সৃষ্ট প্রত্যেক মত-পথের বৈশিষ্ট্য হলো যে প্রত্যেকেই অন্যের উপাসনা পদ্ধতি ও মতকে সত্য হিসাবে স্বীকার করেছে এবং কোনো ব্যক্তিই নিজের উপাসনাকে শ্রেষ্ঠ এবং একমাত্র উপায় হিসেবে গণ্য করে না। সমস্ত পন্থাকেই সঠিক ও সত্য বলে সকলে মনে করে। এই দিক থেকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে ভারতীয় সমস্ত মত-পথ ও পদ্ধতির বিষয়বস্তু প্রকৃতপক্ষে সমান রয়েছে। কেউ যদি তার পদ্ধতি বা পন্থাকে পৃথক বলে মনে করে তবে নিয়মানুসারে তার মোক্ষধর্মও পৃথক হবে কিন্তু ভারতে এই মোক্ষধর্মের কোনো পার্থক্য নির্ণয় করা যাবে না। একাত্মতা মন্ত্রের মাধ্যমে আমরা শিব ও বিষ্ণুকে স্মরণ করি, অব্যক্ত (অনির্বচনীয়) রূপে, স্বামী রূপে ঈশ্বরকে চিন্তা করি, প্রকৃতি পূজার কথা স্মরণ করি, জৈন, বৌদ্ধ ও শিখ সম্প্রদায়ের নামোচ্চারণ করে থাকি।

হিন্দু শব্দকে কেন্দ্র করে কখনও কখনও যে বিতর্ক হয় তার আমরা সমাপ্তি চাই। প্রত্যেক উপাসনা পদ্ধতিতে মোক্ষধর্মের সাম্য রয়েছে—এই হলো আমাদের ঐতিহ্য যা সর্বদা স্মরণযোগ্য। ভারতভূমিতে সৃষ্ট সমস্ত মোক্ষ ধর্মই আমাদের নিজস্ব বিষয়, নামের পার্থক্য থাকলেও প্রত্যেকের মূল্য ও অবদান সমান।

হিন্দুত্বের প্রকাশে সংবিধান

আমাদের সংবিধানে হিন্দুত্বের মূল আদর্শগুলিই অভিব্যক্ত হয়েছে। ভারতের সনাতন আদর্শ ও মূল্যবোধকে স্মরণে রেখেই বাস্তবে আমাদের সংবিধানের প্রস্তাবনা রচিত হয়েছে। ফলে সংবিধান হয়েছে হিন্দুত্বেরই পরিচায়ক। ভারতের সংবিধানে এমন অনেক বিষয় রয়েছে যেগুলি আমরা অন্যদের কাছ থেকে ধার করিনি যদিও একথা সত্য যে সংবিধান রচনার সময় অনেক ব্যবস্থা আমরা ইংরেজদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছি কিন্তু সংবিধানের সর্বাপেক্ষা বৈশিষ্ট্য হলো যে এর প্রস্তাবনা মূলত হিন্দুত্বের আত্মাস্বরূপ। এখানে গণতন্ত্রের লক্ষ্য বিষয়ে ঘোষণা করা হয়েছে যার ভিত্তি হলো সামাজিক ন্যায়, স্বাধীনতা ও সমতা প্রতিষ্ঠা করা। এই তিনটি শর্তই প্রকৃতপক্ষে হিন্দুত্বের বৈশিষ্ট্য। এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর মাধ্যম হলো বন্ধুত্বকে জনতার মনে জাগিয়ে তোলা যা হলো হিন্দুত্বেরই আদর্শ। বন্ধুত্ব যেন আইনের শাসন ও সাম্য প্রতিষ্ঠার সময় কখনও বিচ্ছিন্ন না হয়। আমরা বলি যে হিন্দু-হিন্দু ভাই-ভাই। সমাজে ঐক্য স্থাপনের জন্য বন্ধুত্বের ভাবনা মনে জাগ্রত রাখা একান্ত প্রয়োজন। 'মাতা ভূমি পুত্রোঽহম্ পৃথিব্যা'—সেজন্য আমরা সহোদর ভাই—আমাদের রয়েছে রক্তের সম্বন্ধ। এখানে কেউ ছোট বা বড় নয়—এমন বন্ধুত্বের ভাবনা হলো ভারতের বৈশিষ্ট্য যা অন্য কোনো দেশে কোনোভাবেই বিকশিত হয়নি। ডঃ বাবাসাহেব আম্বেদকরও সংবিধান সভায় বক্তব্য রাখার সময় বলেছিলেন যে আমরা কেবল সাম্যের কথা বলিনি। ফরাসি বিপ্লবের সময় Liberty, Equality ও Justice-এর কথা বলা হয়েছিল কিন্তু আমরা এর জন্য শর্ত হিসাবে মূল কথা যা বলেছি তা হলো—'By Promoting Fraternity'—করুণা, আত্মীয়তা, সংবেদনশীলতা ও অন্যকে আপন করে নেওয়া ইত্যাদি গুণাবলী হলো আমাদের বৈশিষ্ট্য।

প্রকৃত বিষয় হলো যে আমাদের দেশে কোনো কর্মকেই হীন বা ক্ষুদ্র অথবা শ্রেষ্ঠ হিসাবে গণ্য করা হয়নি। হিন্দুত্বের তাই অর্থ হলো যে স্বীয় কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করে আধ্যাত্মিক জীবনের শীর্ষাবস্থা লাভ কর। বংশগত বা জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব হিন্দুত্বের মানদণ্ড নয়। হিন্দুত্বের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে হলো ব্যক্তির মর্যাদা। হিন্দুত্ব বিষয়ে বক্তব্য রাখার সময় আমরা সংবিধান বিষয়ে বলতে পারি যে এই সংবিধান বিদেশি নয়, আমাদের দেশের ব্যক্তিগণ এর রূপকার।

রাষ্ট্রীয়ত্ব (জাতীয়তা)

তৃতীয়ত বিষয় হলো হিন্দুত্বের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে জাতীয় ঐক্য ও একাত্মতা বন্ধুত্ব সৃষ্টিতে উৎসাহ দান, ব্যক্তির মর্যাদা দান—এই দুই বিষয়ের মতো জাতীয় ঐক্য ও একাত্মতার সঙ্গে কোনোরকম আপোশ, রফা হতে পারে না। মহাভারতে বর্ণিত বিদুর নীতি হলো—

ত্যজেদেকং কুলস্যার্থে, গ্রামস্যার্থে কুলং ত্যজেৎ।
গ্রামং জনপদস্যার্থে, আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ।।
(মহাভারত ১-১০৭-৩২)

বৃহত্তর এককের জন্য ক্ষুদ্র একককে পরিত্যাগ করতে হবে। যেখানে একাত্মতা ও ঐক্যের প্রশ্ন আসে সেখানে অন্য অধিকারের বিষয় গৌণ হয়ে যাবে। অধিকার, স্বাধীনতা ইত্যাদি বর্তমান বিশ্বের প্রধান আলোচ্য বিষয় কিন্তু এগুলির তো একটা সীমা রয়েছে, রয়েছে কিছু নিয়ন্ত্রণ। জাতীয় একাত্মতা বজায় থাকলে পারস্পরিক অধিকার লাভে কোনো বাধা সৃষ্টি হয় না কিন্তু যদি ঐক্য ও অখণ্ডতার প্রশ্ন সৃষ্টি হয় তবে ক্ষুদ্র বিষয়ের অধিকার সুনিশ্চিতভাবে পরিত্যাগ করতে হবে।

আমাদের সংবিধানের মূল পাণ্ডুলিপিতে রামায়ণ, মহাভারত, তথাগত বুদ্ধ, মহাবীর, অশোক প্রভৃতি যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তা হলো ভারতের হাজার হাজার বছরের ভাগবত ঐক্যের প্রতীক।

সমরসতা (সহৃদয়তা) ও সামাজিক সুবিচার (ন্যায়)

আমাদের সংবিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট হলো 'দুর্বল শ্রেণীর জন্য ইতিবাচক ক্রিয়া' (Affirmative Action for weaker sections)–AAWS, এই বিষয়টি পৃথিবীর কোনো দেশে না থাকার জন্য এই বৈশিষ্ট্য হলো অদ্বিতীয় এবং এই বিষয়টি হলো প্রকৃত হিন্দুত্বের পরিচায়ক। সংবিধানে প্রত্যেকের জন্য সমান অধিকার সুনিশ্চিত করা হয়েছে একই সঙ্গে যারা যে কোনভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে, পশ্চাৎপদ রয়েছে, তাদের জন্য সংবিধানে ইতিবাচক ক্রিয়া সম্পাদনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভারতবর্ষের ঐতিহ্য হলো পরিবারে যে সদস্য যে কোনো রকমভাবে দুর্বল হোক না কেন তার অধিকার সর্বাধিক—এই হলো হিন্দুত্বের বৈশিষ্ট্য। পরিবারের দুর্বল ব্যক্তিকে কেউ কোনো ভাবেই অবহেলা করে না, কেউ তাকে ভার বা বোঝা বলে মনে করে না—তাকেও পরিবারের একজন সক্রিয় সদস্যরূপে বিবেচনা করা হয়। সমাজের একটি বিশেষ শ্রেণী যারা হাজার-বারোশো বছরে পশ্চাৎপদ হয়েছে তাদের জন্য আমরা সংরক্ষণের চিন্তাভাবনা করেছি। আজও ইউরোপের কোনো দেশে অথবা আমেরিকাতে এমন কোনো ব্যবস্থা করা হয়নি। সাম্যের কথা সেখানে বলা হলেও সাম্য সৃষ্টির জন্য এমন সুযোগ কোথাও দান করা হয়নি।

আমেরিকাতে ৩০ লক্ষ মূল অধিবাসী রয়েছে যারা পৃথক বস্তিতে বসবাস করে। এই অধিবাসীরা আজ পর্যন্ত সমাজের মুখ্য ধারার সঙ্গে সংযুক্ত হয়নি। সেখানে আজও দরিদ্র জনগোষ্ঠী অস্বচ্ছ বস্তিতে বসবাস

করে কিন্তু তাদের জন্য কোনো সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়নি। আমাদের দেশের এই সংরক্ষণ ব্যবস্থা ইংরেজদের অবদান নয়। স্বামী বিবেকানন্দ যখন মহীশূরের রাজার কাছে গিয়েছিলেন তখন রাজা তাঁকে বলেছিলেন যে এখানে অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন করা হয়েছে। স্বামীজী রাজাকে তখন একটি অতি সাধারণ কথা বলেছিলেন—''এই দরিদ্র জনসাধারণ ক্ষুধার জ্বালা মেটাবে না শিক্ষা গ্রহণ করবে? কেবলমাত্র শিক্ষা ব্যবস্থা অবৈতনিক করলে সমস্যার সমাধান হবে না—শিক্ষাকে সমাজের কাছে নিয়ে যেতে হবে। দ্বিতীয় কথা হলো, এই দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে, কারণ এরা যদি শিক্ষা গ্রহণ করতে বিদ্যালয়ে যায় তবে রুজি রোজগারের জন্য কাজ করতে পারবে না, ফলে জীবনধারণ করাই তাদের কাছে দুঃসাধ্য হয়ে উঠবে। এই কারণে ছাত্রবৃত্তি বা খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে।'' স্বামীজীর এই সতর্কবাণীর ফলস্বরূপ মহীশূরের রাজা সর্বপ্রথম দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য নিজের রাজ্যে ছাত্রবৃত্তির ব্যবস্থা করেন যার সুফলে ক্রমে ক্রমে অন্য কিছু রাজ্যেও এই নমুনার (Model) প্রচলন ঘটে। বিশ্বের কোনো দেশেই এমন 'AAWS'-এর ব্যবস্থা নেই। এমন ব্যবস্থাই হলো হিন্দুত্বের আদর্শ।

অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশে এমন ব্যবস্থা না থাকার কারণে আমাদের কোনো অভিযোগ নেই। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন যে আমরা দ্বিবিধ পাপ কর্মের সঙ্গে যুক্ত—প্রথমত, সাধারণ জনতাকে উপেক্ষা এবং দ্বিতীয়ত, নারী জাতিকে অবহেলা। আমরা কারিগরকে, দৈহিক পরিশ্রমে মাধ্যমে উপার্জনকারীকে এবং গরিবদের উপেক্ষা করেছি—এদেরকে কৃপা করলে হবে না—, কেবলমাত্র সুযোগ দান করতে হবে, কারণ এরা সকলেই আমাদের সমকক্ষ। এদের মধ্যেও রয়েছে দেবত্ব যা আমাদের মধ্যেও রয়েছে 'They are also divine'। এ কথা সর্বদা স্মরণযোগ্য যে এরা কখনই আমাদের অপেক্ষা হীন বা দুর্বল নয়। কেবলমাত্র সুযোগ লাভ করলেই এরা হয়ে উঠবে আমাদের সমকক্ষ। বর্তমান সমাজে যারা পাশ্চাৎপদ রয়েছে তাদেরকে আমাদের সমকক্ষ করে তুলতে হবে।

আধ্যাত্মিক গণতন্ত্র

প্রকৃতপক্ষে সমগ্র বিশ্বে হিন্দু সমাজ ছাড়া অন্য কোনো সমাজে গণতন্ত্রের অস্তিত্ব নেই। হিন্দুত্বের মধ্যে সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক গণতন্ত্র (Absolute Spiritual Democracy) নিহিত রয়েছে। পৃথিবীর কোনো সম্প্রদায়ই অন্য সম্প্রদায়কে নিজেদের সমকক্ষ মনে করে না। তারা অন্য সম্প্রদায়কে সহ্য করতে পারলেও গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নয়। কারণ অন্য সম্প্রদায়কে তারা নিজেদের সমকক্ষ হিসাবে কখনই গণ্য করে না। হিন্দুরা সমস্ত উপাসনা পদ্ধতির সত্যতা স্বীকার করে এবং সমস্ত উপাসক সম্প্রদায়কে সমান জ্ঞান করে। কোনো উপাসনা পদ্ধতিকেই আমারা ত্রুটিপূর্ণ বলে মনে করি না। হিন্দুত্ব বিষয়ে সংজ্ঞাদান ও ব্যাখ্যা করার সময় সংবিধানের প্রসঙ্গও উল্লেখ করা প্রয়োজন।

যখন হিন্দুত্বের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করা হয় তখন অনেক সময় আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গও উল্লেখ করতে হয়। কিন্তু প্রকৃত বিষয় হলো যে আমাদেরই একমাত্র পদ্ধতি যেখানে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চারটি পুরুষার্থের কথা বলা হয়েছে। আমাদের বৈশিষ্ট্য হলো যে আমরা সমৃদ্ধির সঙ্গে আধ্যাত্মিকতাকে যুক্ত করেছি। বিদ্যার সঙ্গে এখানে অবিদ্যারও কথা বলা হয়েছে। যেমন পরাবিদ্যা রয়েছে তেমনি হিন্দুত্বে রয়েছে অপরা বিদ্যা। কেবলমাত্র পরলোকের কথাই আমরা বলিনি কিন্তু কোনো এক সময়ে ক্রমে ক্রমে সমাজ মনে করতে লাগলো যে হিন্দুত্বের অর্থই হলো পরলোক বিষয়ে চিন্তা করা, জীবনযাত্রা নির্বাহের নিয়ম, বিধান ইত্যাদি বিষয়ে উপদেশ দান। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হিন্দুত্ব সমগ্র জীবন ব্যবস্থাকে সামগ্রিক ভাবে গ্রহণ করেছে। এই বিষয়ে অপর এক বৈশিষ্ট্য হলো যে প্রত্যেক ব্যক্তি যে কোনো কর্মে লিপ্ত থাকুক না কেন তার পূর্ণতা লাভের জন্য তাকে সদা সচেষ্ট থাকতে হবে। এই পূর্ণতা প্রাপ্তির প্রয়াসকে আমরা বলেছি আধ্যাত্মিকতা। আমাদের এখানে সঙ্গীত সাধককে কখনই সঙ্গীত ত্যাগ করে পূজাপাঠের জন্য মনোযোগ দান করতে বলা হয় না। সঙ্গীত সাধকের নিকট সঙ্গীতই হলো সাধনা—এই হলো তার পূজা। কারণ নাদশক্তির উপাসনা করতে করতে 'নাদ' ব্রহ্মকে লাভ করা যায়—এই আমাদের বিশ্বাস। একইভাবে অক্ষর-সাধনার মাধ্যমে যে কেউ অক্ষরব্রহ্ম লাভ করতে সক্ষম হয় কিন্তু সর্বমোট সিদ্ধান্ত হলো যে সর্বপ্রকার কর্ম-সাধনার মূল লক্ষ্য হলো তার পূর্ণতা লাভ, এই কারণেই এই দেশে সৃষ্টি হয়েছে এক অদ্ভুত সংস্কৃতি ও সভ্যতা। মন্দির নির্মাণ হোক, স্থাপত্য কলা সৃষ্টি বা ভবন নির্মাণ হোক, বাঁধ তৈরি ও কৃষিকার্য্য, চিত্রকলা সৃষ্টি অথবা রন্ধন কার্যই হোক না কেন সমস্ত কার্যেই শ্রেষ্ঠত্ব লাভের জন্য এখানে সচেষ্ট থাকার উপদেশ দান করা হয়েছে।

একবার অজন্তা-ইলোরার গুহা দর্শনে গেলে সেখানে গাইড যখন চিত্রগুলির বর্ণনা দান করেছিলেন তখন চিত্রগুলির বৈশিষ্ট্য বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে গাইড বললেন—''এই চিত্রগুলিতে চিত্রিত কেশবন্ধন ও পোশাকপরিচ্ছদ বিষয়ে লক্ষ্য দান করলে দেখা যাবে যে সেখানে কয়েকশো প্রকারের কেশবিন্যাসের নমুনা রয়েছে।'' কিন্তু বর্তমানে এক অদ্ভুত ফ্যাশন ও চুল রাখার পদ্ধতি চালু হয়েছে। যুবক-যুবতীরা এমন এক অদ্ভুত অচেনা 'ডিজাইন' পছন্দ করেছে যা দেখে স্বাভাবিক ভাবেই মনে হবে যে তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। কিন্তু এই সব 'ডিজাইন' আমাদের কাছে নতুন বিষয় নয়। কিছুদিন আগে অম্বানী গোষ্ঠী মুম্বাইয়ে এক নতুন কেন্দ্রের উদ্বোধন করে যেখানে পোশাকের 'ডিজাইন' প্রদর্শিত হয়। এই প্রদর্শন থেকে জানা যায় যে ১৭০০-১৮০০ খ্রিস্টাব্দে অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতে ফ্যাশন জগতের নামি-দামি কাপড় ভারতবর্ষেই তৈরি হতো। বিদেশের মহারানি বা রাজপরিবারের সদস্যরা বিশেষ অনুষ্ঠানে যে সমস্ত পোশাকপরিচ্ছদ পরিধান করতো সেগুলো সবই ভারত থেকে আমদানি করা হতো। এই ধরনের পোশাকপরিচ্ছদের এক বিখ্যাত প্রদর্শনী ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত হয়। এখানে ২০০-৩০০ বছর পূর্বে ভারতে তৈরি হওয়া ভিন্ন ভিন্ন ডিজাইনের পোশাকপরিচ্ছদ প্রদর্শিত হয়েছিল।

নিত্য নতুন, চির পুরাতন

ভারতের আধুনিকতার ও প্রাচীনতার মেলবন্ধন সর্বকালে লক্ষ্য করা যায়। আধুনিক ও গতানুগতিক বিষয়ের মধ্যে কোনো সংঘর্ষ এখানে হয়নি, কারণ প্রত্যেক বিষয়ের পরিবর্তনের মান্যতা এখানে

রয়েছে। হিন্দু সমাজ জাগতিক-মূল্যবোধ বিষয়েই কেবল চিন্তাভাবনা করেনি সেগুলিকে এক গুরুত্বপূর্ণ পালনীয় বিষয় হিসাবেও গ্রহণ করেছে। হিন্দুত্বের ভাবনা যখন প্রভাবশালী হবে তখন কুম্ভমেলার যেমন ব্যবস্থা হবে, তেমনি তৈরি হবে অভিনব মন্দির এবং একই সঙ্গে হিন্দু সমাজ যাতে আর্থিকভাবে সমৃদ্ধ হয় তার জন্য শিল্প, কলকারখানাও প্রতিষ্ঠিত হবে। আমরা জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই পশ্চাৎপদ হতে রাজি নই। সুতরাং নিজেদেরকে পশ্চাৎগামী না করে সমৃদ্ধির লক্ষ্যে অগ্রসর হতে হবে। হিন্দুত্বের লক্ষণই হলো প্রত্যেক ক্ষেত্রে পূর্ণতা লাভের জন্য অগ্রসর হওয়া এবং এই কারণে আমরা জীবন-ব্যবস্থাকে সামগ্রিক ভাবে বিচার করেছি।

ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চারটি পুরুষার্থের চরিতার্থতার জন্য আমাদের মহাপুরুষগণ উপদেশ দান করেছেন যে আমাদের যা কিছু কর্তব্য নির্ধারিত হয়েছে তা আনন্দের সঙ্গে ও সকলের মঙ্গলের জন্য সম্পন্ন করতে হবে এবং এই কর্তব্য-সাধনের মাধ্যমেই ঈশ্বর প্রাপ্তি সম্ভব—এই হলো আমাদের সাধনা। জীবনের যে কোনো ক্ষেত্রের কাজকে কর্তব্য হিসাবে গ্রহণ করে তা উৎকৃষ্ট রূপে সম্পন্ন করে ব্যাপক কল্যাণ সাধনের মাধ্যমে যে কাজের পূর্ণতা লাভ করতে হবে এবং এই পথেই ঈশ্বরকেও লাভ করা সম্ভব। নিজেদের ত্রুটি-বিচ্যুতিকে স্বীকার যেগুলির সংশোধন করে পবিত্র জীবন রচনাই হলো বর্তমানের চাহিদা।

বিগত হাজার বছরের সংঘর্ষের কালে প্রায় ৪০০ বছর কুম্ভমেলা অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। সপ্তদশ শতকের পর এই মেলা পুনরায় শুরু হয়। তারপর ২০০ বছর ধরে কোথাও কুম্ভমেলার আয়োজন করা হলে সেখানে মারাঠা নৃপতিগণ, মহারাজা রণজিৎ সিংহ এবং দেশের অন্যান্য হিন্দু রাজারা সৈন্য প্রেরণ করতেন যাতে মেলা নির্বিঘ্নভাবে সম্পন্ন হয়। তখন থেকেই সমস্ত প্রকার ধর্মীয় অনুষ্ঠান আয়োজিত হতে থাকলেও তা অব্যবস্থিত রূপে অনুষ্ঠিত হতো, কারণ ইসলামি শাসকের কুদৃষ্টির ফলে সুচারুরূপে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যেমন সম্ভব ছিল না তেমনি তার উদ্দেশ্য বিষয়েও জনতার কোনো ধারণা সৃষ্টি হতো না। বর্তমানে যখন হিন্দু সমাজ নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই নিয়ন্ত্রণ করছে তখন অস্বচ্ছতা, অব্যবস্থিত এবং লোক দেখানো অনুষ্ঠান, উদ্‌যাপন করা আমাদের পরিচয় হতে পারে না। আমাদের মন্দির, তীর্থস্থান, যথাযথ অনুষ্ঠান এবং সুব্যবস্থা প্রভৃতি দিকগুলি উদাহরণ স্বরূপ হওয়া দরকার। এ সমস্ত অনুষ্ঠান এবং উদ্‌যাপনকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে সংগঠিত ও ব্যবস্থিত করার বিষয়ে আমাদের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে হবে।

বারাণসীতে একটি বিশাল মন্দিরে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক উপস্থিত ছিলেন। এই প্রথমবার প্রায় ৪০০–৫০০ মন্দিরের সঞ্চালক ও ব্যবস্থাপকদের সেখানে উপস্থিত থাকার জন্য আহ্বান জানানো হয়। এছাড়াও বিশ্বব্যাপী প্রায় ১৫০০ মন্দিরের ব্যবস্থাপক সমিতির সদস্যদের অন-লাইনে এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। এই অনুষ্ঠানে আমাদের সমাজের মন্দিরগুলির ব্যবস্থাপনা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, আবর্জনা পরিষ্কারের ব্যবস্থা এবং মন্দির দ্বারা আয়োজিত অনুষ্ঠান কীভাবে সঞ্চালন করা দরকার ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়। বিগত হাজার বছর কালখণ্ডের পরিস্থিতিজনিত ব্যবধানের জন্য সমাজে যে ত্রুটি-বিচ্যুতি সৃষ্টি হয়েছে বর্তমানে সেগুলির অবসানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা দরকার। আমাদের দ্বারা আয়োজিত অনুষ্ঠান যেন সর্বোৎকৃষ্ট হয় সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্যদান করা কর্তব্য।

মহিলাদের সহযোগিতা ও তাঁদের সম্মান দান

হিন্দু জীবন ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের চিন্তা করা দরকার যে বিগত মধ্যবর্তী কালখণ্ডে যে সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি সৃষ্টি হয়েছিল সেগুলিকে বর্তমানে কীভাবে সমাপ্ত করা যায়। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনার সময় এমন বহু বিষয় উত্থাপিত হয়, যেমন মহিলাদের প্রতি ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হওয়া উচিত। বিগত একশো বছর ব্যাপী সঙ্ঘের সঙ্গে সমাজের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সৃষ্টি হওয়ার জন্য বর্তমানের নারীবাদী আন্দোলন বিষয়েও অনেক কথা আলোচনাক্রমে এসে যায়। দৈহিক গঠনানুযায়ী প্রকৃতি নারী ও পুরুষের মধ্যে যতটা ভিন্নতা সৃষ্টি করেছে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে আমরা ততটা পার্থক্যের কথা চিন্তা করেছি—এর বেশি অন্য কিছু চিন্তা আমাদের নেই। যে সমস্ত কাজ পুরুষেরা সম্পন্ন করতে সক্ষম, মহিলারাও তা করতে সমর্থ। মুসলমানদের আক্রমণের সময় এমন এক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল যার ফলে মহিলাদের নিরাপত্তা ও সম্মান রক্ষার বিষয়টি চিন্তাজনক হয়ে উঠেছিল। ফলে ওই সময়ে মহিলাদের জন্য পর্দা-প্রথা, ঘোমটা ব্যবহার ও ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থাকা ইত্যাদি ব্যবস্থার প্রচলন ঘটে। সমাজের এই চিত্র প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে খাপ খায় না।

বেদে ২৬ জন ঋষিকার নাম উল্লেখিত হয়েছে। ঋষি ও ঋষি পত্নী যৌথভাবে গুরুকুল পরিচালনা করতেন। আমাদের এখানে অধ্যাত্মিক দৃষ্টি থেকে নারী জাতিকে দেবী ও শক্তিরূপা ভেবে যখন তাদের পূজা করা হয় তখন তাদেরকে মাহেশ্বরী, মহাকালী, মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতী এই চারটি রূপে কল্পনা করা হয়। নারী কেবলমাত্র ধনরূপা নয় সে তো জ্ঞান, কলা, সংস্কৃতি ও সৌন্দর্যেরও অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তাঁকে আমরা শক্তিস্বরূপা রূপে অর্চনা করেছি। এই হল আমাদের স্ত্রী-ভাবনার মূল কথা। সেই জন্য স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন যে আমরা দুটি প্রধান পাপ করেছি—প্রথমত, হলো স্ত্রী জাতিকে অবহেলা এবং দ্বিতীয়ত, দৈহিক পরিশ্রমকারী সাধারণ জনতাকে ঘৃণা। মহিলাদের বিষয়ে আলোচনার সময় স্বামীজী বলেছেন, ‘‘ওদের জন্য কারও কোনো কৃপা করার প্রয়োজন নেই—ওরা তো স্বয়ং জগজ্জননী। কেবলমাত্র তাদের সুযোগ দিতে হবে, সুযোগ লাভ করলেই ওরা নিজের ভাগ্য নিজেই তৈরি করবে।’’

সম্পূর্ণ ভারতবর্ষই হলো এমন এক দেশ যেখানে মহিলাদের নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কোনো সংঘর্ষ করতে হয়নি। অন্যান্য সমস্ত দেশেই স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য মহিলাদের সংগ্রাম করতে হয়েছে। ফ্রান্সের বিপ্লবের ঘটনা গর্বের সঙ্গে বলা হয় যেখানে ‘সাম্য’ প্রতিষ্ঠার ঘোষণা করা হয়েছিল। বর্তমানে ১৪ জানুয়ারি ‘বাস্তিল দিবস’ উদ্‌যাপন করা হয়। ওই অনুষ্ঠানে প্রথম ঘোষণা করা হয়েছিল যে ফ্রান্সে অভূতপূর্ব পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, এখন সামন্ততন্ত্রের অবসান

ঘটিয়ে সাম্য ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার কাজের সূত্রপাত ঘটেছে। প্রকৃতপক্ষে এই সাম্য ছিল কেবলমাত্র পুরুষদের জন্য, মহিলাদের জন্য সাম্যের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কেননা এই বিপ্লবের ২০০ বছর পরেও মহিলারা নির্বাচনে মতদানের অধিকার লাভ করেনি।

পৃথিবীর সমস্ত দেশেই নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য মহিলাদের সংগ্রাম করতে হয়েছে কিন্তু কেবলমাত্র ভারতবর্ষে মহিলাদের অধিকার দানের জন্য পুরুষেরা সচেষ্ট হয়েছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় দয়ানন্দ সরস্বতী স্ত্রী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার জন্য সচেষ্ট হন। লক্ষণীয় বিষয় হলো যে স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের নারীদের অবদান উদাহরণস্বরূপ। স্বাধীনতা লাভের পর স্বাধীন দেশে মহিলাদের ভোট দানের অধিকার বিষয়ে কোনরূপ মতানৈক্য লক্ষ্য করা যায়নি বরং খুব স্বাভাবিকভাবেই এই বিষয় সংবিধান সভায়, উত্থাপিত হয়েছে উত্থাপিত হয়েছে এবং মহিলাগণ ভোটদানের অধিকার লাভ করেছে। কেউ কোনো বিরোধিতা করেননি।

সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে মহিলাদের ভূমিকা ও অংশগ্রহণ ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্ছে। শিক্ষালাভ করে মহিলারা প্রতিটি বৃত্তীয় (পেশাগত) ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে এবং করছে। সামাজিক, ধর্মীয়, ব্যবসায়িক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণ বিশেষ লক্ষণীয় বিষয়, তবুও এখনও মহিলাদের সামাজিক ভূমিকা আরও বৃদ্ধি পাওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আগামী দিনে হিন্দু সমাজের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে মহিলাদের যোগদানের ব্যবস্থা করতে হবে। কোনও মন্দির-সমিতি হোক বা উৎসব-উদ্‌যাপন সমিতি হোক সেগুলি যেন মহিলা সদস্য ব্যতীত গঠিত হতে না পারে সে বিষয়ে লক্ষ্য দান করা উচিত। ক্রমে ক্রমে সামাজিক সংগঠনে ও প্রতিষ্ঠানে এবং যে কোনো অনুষ্ঠানে মহিলাদের ভূমিকা বৃদ্ধির বিষয়ে সচেষ্ট থাকতে হবে। আজ পর্যন্ত যেখানে মহিলাদের কোনো ভূমিকা নেই এমন সব ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা সৃষ্টির জন্য সচেষ্ট হওয়ার অর্থই হলো হিন্দু মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ।

বর্তমানের স্মৃতিশাস্ত্র হলো সংবিধান

বিভেদহীন সমাজ রচনা হলো সঙ্ঘের আদর্শ। আমরা যে কোনো বিভেদ ও অস্পৃশ্যতাকে অস্বীকার করেছি। বর্তমানে যে জাতিসঙ্ঘের স্বরূপ ভারতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে তা কখনোই ভারতের ঐতিহ্য নয়, এখন জাতি ও বর্ণ পরস্পরে মিলে এক হয়ে গেছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভারতে কোনো বর্ণ ছিল না। আমাদের সমাজে এক নিজস্ব ব্যবস্থা ছিল। কেউ কেউ কখনও বলে থাকেন যে বর্ণ-ব্যবস্থা খুব ভালো কিন্তু এই বর্ণ-ব্যবস্থাকে সমর্থন করার কোনো প্রয়োজন নেই, কেননা বর্তমানে তার প্রচলন নেই। সঙ্ঘের তৃতীয় সরসঙ্ঘচালক বালাসাহেবজীকে কেউ প্রশ্ন করেছিল যে, জাতি ব্যবস্থার প্রয়োজন নেই, অস্পৃশ্যতাও স্বীকার্য নয় কিন্তু বর্ণ-ব্যবস্থা বিষয়ে সঙ্ঘের মতামত জানার ইচ্ছে হচ্ছে। এই বিষয়ে পূজনীয় বালাসাহেবজীর উত্তর খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেছিলেন 'কোন ব্যবস্থার কথা বলছেন? কোথায় সেই ব্যবস্থার প্রচলন রয়েছে? কমপক্ষে বিগত এক হাজার বছর ধরে ভারতে কোথাও বর্ণ-ব্যবস্থার প্রচলন নেই। হয়তো এমন ব্যবস্থা আগে ছিল কিন্তু আজ তার কোন অস্তিত্ব নেই। বর্তমানে যা কিছুর প্রচলন আছে তা অব্যবস্থারই নামান্তর।' তিনি পরে আরও বলেন—'যা কিছু অব্যবস্থিত রয়েছে তার সমাপ্তি দরকার। এই ব্যবস্থা আজ যেভাবে প্রযুক্ত হচ্ছে তা আমাদের সমাজে আদর্শ হিসাবে কখনই গৃহীত হয়নি তাছাড়া সমাজে তো নিত্য নতুন ব্যবস্থার প্রচলন হতেই থাকে।'

মনুস্মৃতি বিষয়ে আলোচনার সময় লক্ষ্য করা গেছে যে অনেকেই কেবল তাকেই সমর্থন করেন কিন্তু আমরা কোনো একটি গ্রন্থের বন্ধনে কখনই আবদ্ধ হইনি। আমাদের এখানে কালে কালে স্মৃতিশাস্ত্রের সৃষ্টি হয়েছে, স্মৃতি অর্থাৎ সেই সময়ের সংবিধান। বর্তমানে ওই স্মৃতিশাস্ত্র হলো ভারতের সংবিধান। যা কিছু সংবিধানসম্মত তাকেই আমরা গ্রহণ করে থাকি। অন্য কিছু বিষয়কে অবলম্বন করে বাদ-বিবাদ সৃষ্টি করা উচিত নয়। হাজার হাজার বছর ধরে ভারতের জীবন প্রবাহে কালে কালে বহু স্মৃতি রচিত হয়েছে। ইংরেজরা যে সময়ে মনুস্মৃতি বিষয়ে উল্লেখ করেছে সে সময় ভারতের কোনো রাজ্যেই মনুস্মৃতির উপর নির্ভর করে শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল না। সে সময় বিভিন্ন রাজ্য শাসিত হতো সংবিধানকে কেন্দ্র করে। ব্রিটিশ শাসিত ভারতে গোয়ালিয়র, জয়পুর, উদয়পুর প্রভৃতি হিন্দু রাজার দ্বারা শাসিত স্বাধীন রাজ্যগুলির শাসন পদ্ধতিতে মনুস্মৃতির অনুসরণের কোনো প্রমাণ লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু ইংরেজদের দ্বারা মনুস্মৃতির উল্লেখের কারণ সম্পূর্ণরূপে অবোধ্য। পরিবর্তনশীল সমাজে ব্যবস্থা ও স্মৃতির (সংবিধান) পরিবর্তন হতেই থাকে।

গ্রহণীয়তা

বর্তমানে অন্য এক আলোচনার বিষয় হলো বাক্‌স্বাধীনতা। কেউ কোনো বিরূপ মন্তব্য করলে বা রুচিবিরুদ্ধ পোশাকপরিচ্ছদ ব্যবহার করলে তার বিরুদ্ধে FIR করা, Notice দেওয়া অথবা সে বিষয়ে উত্তেজক বক্তব্য দান হিন্দুত্বের পরিচায়ক নয়। প্রতিটি বিষয়ে অতি সক্রিয় না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কেউ যদি বিরূপ মন্তব্য করেও থাকে তবে তার জন্য বিশেষ কোনো লাভ বা ক্ষতি হয় না। ভারতের হিন্দু সমাজ থেকে বেশি বাক্‌স্বাধীনতা বা অভিব্যক্তির স্বাধীনতা বিশ্বের মধ্যে আর কোথাও নেই। এখানে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র নিজের রাজ্যেই তাঁর প্রজাদের দ্বারাই সমালোচিত হয়েছেন। প্রশ্ন ও প্রতিপ্রশ্ন, পক্ষ ও প্রতিপক্ষ এবং আলোচনা ও সমালোচনা— এ সবই আমাদের ঐতিহ্য।

ভারতে সমালোচনা করা খুব স্বাভাবিক বিষয়। সন্ত কবীর রচিত সমস্ত কবিতাই তো সমলোচনামূলক। চার্বাক থেকে আর কেউ এত বেশি বেদের নিন্দা করেননি। তিনি বেদ-পাঠক সম্বন্ধে যা বলা উচিত নয়, তাও বলেছেন কিন্তু তবুও তাকে আমরা ঋষি হিসাবেই গ্রহণ করেছি। সমাজের বিবেক বুদ্ধির উপর আমাদের ভরসা রাখা দরকার। প্রত্যেক কালখণ্ডে শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা দানের জন্য যেমন সমাজে বিদ্বান ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেছেন তেমনি শাস্ত্র বিষয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করার জন্য বিদ্বান ব্যক্তির অভাবও এখানে ছিল না। আমাদের সমাজের বোধশক্তির উপর বিশ্বাস রাখা দরকার। কোনও অপপ্রচার বা কোনো অনৈতিক ঘটনার কুপ্রভাব আমাদের সমাজের খুব একটা ক্ষতি করতে সক্ষম নয়। সেই কারণে উত্তেজনা সৃষ্টি করার জন্য আক্রমণাত্মক আচরণকে হিন্দুত্ব কখনই প্রশ্রয় দেয়নি। (ক্রমশ)

(লেখক রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহ সরকার্যবাহ)

রামকৃষ্ণ-সত্যানন্দলোকে স্বামী মৃগানন্দ মহারাজ

স্বপন কুমার পাল

হিন্দু সমাজ একজন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ককে হারালো। গত ১৩ নভেম্বর স্বামী মৃগানন্দ মহারাজ রামকৃষ্ণ সত্যানন্দলোকে গমন করলেন। তখন শহর কলকাতা ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন, যাদবপুরের সত্যানন্দ দেবায়াতনে অন্ধকার নেমে এলো, যেন দিনের আলো ম্লান হয়ে গেল।

মৃগানন্দ মহারাজ ১৯৪৩ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি পূর্ববঙ্গের দিনাজপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তার ছেলেবেলা কাটে বিহার রাজ্যের ফরবেশগঞ্জে, যেটা নেপাল সীমান্ত অঞ্চলে অবস্থিত। তিনি ছিলেন জৈন পরিবারের সন্তান। পূর্বাশ্রমের নাম ছিল মৃগেন্দ্র দুগার। তিনি ছিলেন একজন সফল চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। একটি কোম্পানিতে উচ্চপদে আসীন ছিলেন।

১৯৬৭ সালে বরানগরের কাচের মন্দিরে ঠাকুর শ্রীশ্রী সত্যানন্দ দর্শনে তাঁর জীবনের গতিধারা পালটে গেল। তার মন তখন আধ্যাত্মিকতার ভাবধারায় আচ্ছন্ন। ক্রমেই ঠাকুরের শ্রীচরণে তিনি নিজের জীবনকে সমর্পণ করে দিলেন। কিন্তু দু'বছর যেতে না যেতেই শ্রীশ্রী সত্যানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণলোকে যাত্রা করলেন। তখন সত্যানন্দ দেবের মানসকন্যা শ্রীশ্রী অর্চনাপুরী মা মন্দিরের অন্দরমহলে। মৃগেন্দ্র দুগার তখন মাকে অনুরোধ করলেন আশ্রমের হাল ধরে জন্য ভক্তদের সম্মুখে আসার জন্য। মা-ও তাঁর গোপালকে চিনতে ভুল করলেন না। ১৯৭২ সালে সন্ন্যাস গ্রহণের মাধ্যমে মৃগেন্দ্র থেকে মৃগানন্দ মহারাজে রূপান্তর ঘটল।

এরপর তিনি ১৯৭৬ সালে যাদবপুরে সত্যানন্দ দেবায়তন প্রতিষ্ঠা করে শ্রীশ্রী অর্চনাপুরী মাকে নিয়ে এলেন। ক্রমেই হয়ে উঠলেন মায়ের মতোই একজন উচ্চ সাধক। তিনি দেশ, হিন্দুত্ব, এসব নিয়ে গভীর চিন্তা করতেন। তিনি ছিলেন অসাধারণ বাগ্মী, লেখক। লিখে গেছেন অনেক বই। তাঁর রচিত কয়েকটি গ্রন্থ হলো, 'অলৌকিক কৃপাময় সত্যানন্দ', 'যত মত তত পথ–হিন্দু ঐক্যের ভিত্তি', 'হিন্দুত্বের জাগরণ অনিবার্য', 'বিশ্বের হিন্দু এক হও', 'হিন্দু অর্থ ও তাৎপর্য', 'বিবেকানন্দের হিন্দু চেতনা', 'সত্যানন্দ ভাগবত', 'সাধনার পথে', "Untouchability & Cast Division", "Hindu meaning and significance", "As many faiths So many ways" ইত্যাদি।

তিনি অনেক কবিতা, গান রচনা করেছেন। তিনি খুব সুন্দর গানও গাইতে পারতেন। অসাধারণ চণ্ডীপাঠ করতেন। খুব সুন্দর বাংলাভাষায় কথা বলতেন। বাংলাভাষায় তিনি অনেক কবিতা বই গান লিখেছেন। বাংলা, হিন্দি, ইংরেজি ও সংস্কৃত এই চারটি ভাষাতেই তার খুব দখল ছিল। সংস্কৃতে তিনি অনর্গল কথা বলতে পারতেন।

তিনি ছিলেন স্পষ্টবক্তা ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন একজন মানুষ। সারা দেশ যখন শ্রীরামজন্মভূমি আন্দোলনে উত্তাল, তখন সবকিছু বাধা অতিক্রম করে যাদবপুরে সত্যানন্দ দেবারতনে 'রামশিলা' পূজন করেছিলেন। তার আশ্রমের সমস্ত ভক্ত উৎসাহের সঙ্গে সেই শিলাপূজনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি আট থেকে আশি বছর সকলের সঙ্গে মিশে যেতে পারতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন ধর্মবর্জিত কোনো শিক্ষা এদেশে সম্ভব নয়। এদেশের আত্মা ধর্ম এবং হিন্দুত্বই ভারতের রাষ্ট্রীয়ত্ব। তিনি ১৯৯২ সালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরের উত্তর ভাগে প্রতিষ্ঠা করেন সত্যানন্দ মহাপীঠ। তিনি সত্যানন্দ দেবায়তন ও সত্যানন্দ মহাপীঠের অধ্যক্ষ ছিলেন। সেখানে প্রতিষ্ঠা করেছেন সত্যানন্দ বিদ্যা নিকেতন। স্থানীয় গরিব পরিবারের ছেলে-মেয়ে সেই বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে।। বৈদিক চিন্তাভাবনায় তিনি গুরুকুল শিক্ষা পদ্ধতি চালু করেন। তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল মানুষকে, ছাত্র-ছাত্রীদের নৈতিকতার শিক্ষায় শিক্ষিত করতে। সেই সঙ্গে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করাই তাঁর মহাপীঠের স্থাপনের মূল লক্ষ্য ছিল।

মহাপীঠের পরিকল্পনার অনেক কাজই তিনি করে যেতে পারলেন না। সেই অঞ্চলে পানীয় জলের ব্যবস্থা, বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা করেছেন, স্বাস্থ্য কেন্দ্র তৈরি করছেন। স্থানীয় প্রশাসনও তাঁকে সাহয্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। নানাবিধ সামাজিক কর্মকাণ্ড সেখানে শুরু করেছিলেন কিন্তু তাঁর প্রয়ণে অনেক কাজ অসম্পূর্ণ রয়ে গেল। তাঁর বিশ্বাস ছিল, তাঁর ভক্তরা একদিন সেই কাজ পূর্ণ করবেন। □